বুলেটিন নং: ১৬
বর্ষ ৬ ॥ সংখ্যা ৪
প্রকাশ কাল: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ৫ ॥ $2

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

দালাল দি গ্রেট সন্তু লারমার সেনা তোষণ

আত্মসমর্পনকারী জেএসএস নেতা সন্তু লারমা সম্প্রতি ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর ৩০৫ পদাতিক ডিভিশনের ব্রিগেড মেসে অনুষ্ঠিত একটি কম্পিউটার কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত জনগণের ওপর নির্যাতনকারী সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। এলাকায় "শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে" ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ও অবদান রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এমনকি তিনি সেনাবাহিনীকে "দেশের গর্ব" বলে অভিহিত করেছেন। এ খবর গত ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অবজারভার সহ দেশের অন্যান্য জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে নীচে বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত রিপোর্টের মূল অংশ তুলে ধরা হল:

[Chairman of the Chittagong Hill Tracts Regional Council Jyotirindra Bodhipriyo Larma (Santoo Larma) today highly praised the performances of the armed forces to bring peace in the area, reports BSS.

He termed the armed forces as "pride" of the country. Mr. Larma was speaking as the chief guest at the certificate awarding ceremony of a computer course held at 305 Infantry Brigade Mess here.

He lauded the role of local army in bringing about a positive change in socio-economic condition of the people of this region including imparting computer training to unemployed youths.]

পাশের এই ছেলেটির নাম জ্যোতিময় চাকমা, বয়স ১১ বছর। তার বাবার নাম তুত্তরু শিং চাকমা। গ্রাম বেঙ্গীছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি জেলা।
গত ১৭ মে, ২০০০ সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া একটি সন্ত্রাসী দল তাদের গ্রামে হানা দেয়। কুখ্যাত আত্মসমর্পনকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য রণতূর্য এ হামলার মূল হোতা। সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর কায়দায় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে, কার কার কাছে অস্ত্র আছে সে জানে কিনা। ছেলেটি জানে না বলে উত্তর দিলে তারা তাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে। বুকে পিঠে পেটে কিল ঘুষি ও লাথি দেয়। ফলে ছেলেটি বুকে সাংঘাতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সে জানে না তার অপরাধ কি? সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীদের কাছ থেকে অবোধ শিশুদেরও নিস্তার নেই।

আসলে দালালরা এক বিচিত্র জীব। সাবেক গেরিলা নেতা থেকে বর্তমানে নিকৃষ্ট দালালে বিবর্তিত সন্তু লারমা সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ পদলেহন করে এ কথার সত্যতা আবার প্রমাণ করলেন। যে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে দখলদার বাহিনীর মতো নিরীহ জনগণের ওপর বিগত ২৫ বছর ধরে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে, যে সেনাবাহিনী শত শত লোককে খুন করেছে, অসংখ্য মায়ের বুক খালি করেছে, যে সেনাবাহিনী আমাদের প্রিয় বোন কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করেছে, বহু মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, যাদের অত্যাচারের কাহিনীর শেষ নেই- সেই সেনাবাহিনীকে জাতির গর্ব বলা সন্তু লারমার মতো একজন জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও কুলাঙ্গারের পক্ষেই সম্ভব। শোনা যায় তিনি নাকি দালালীর দীক্ষা নেয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মধ্য রাতে দালালী পেশায় তার অগ্রজ সমীরণ দেওয়ানের সাথে গোপন অভিসারে মিলিত হন।
সেনাবাহিনী যদি দেশের গর্ব হয়ে থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে থাকে তাহলে ঐ আত্মসমর্পনকারী গেরিলা নেতাটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কি ভুল করেননি? এভাবে সেনাবাহিনীর উলঙ্গ গুণকীর্তন করে সন্তু লারমা কি জনগণের এত বছরের ন্যায় সঙ্গত প্রতিরোধ সংগ্রামকে অস্বীকার ও হেয় করলেন না? সন্তু লারমা নিজে নিপীড়নকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে ভুল করে থাকতে পারেন এবং এই ভুলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুতপ্ত হয়ে সেনাবাহিনীর পদলেহন করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন, কিন্তু জনগণ ও শত শত দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা জানেন তারা এত বছর ধরে জাতিগত সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও বর্বর দমন পীড়নের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন ও যে লড়াই এখনো অব্যাহত রেখেছেন তা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও গৌরবোজ্জ্বল। জনগণ তাদের এই গৌরবোজ্জ্বল লড়াই সংগ্রামকে সন্তু লারমার দালালীতে কখনো ম্লান হতে দেবেন না। বরং তারা তা উর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে যাবেন।
সন্তু লারমা জনগণের বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন সংগ্রামকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থে সস্তা দরে বিকিয়ে দিয়ে তার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন, এই কৃত অপরাধের জন্য তিনি ও তার চেলা চামুন্ডারা এখন জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, নিন্দিত ও ঘৃণিত। গদি টিকিয়ে রাখার জন্য ও গণ রোষ থেকে বাঁচার জন্য তাই সেনাবাহিনী ও সরকারই তাদের একমাত্র ভরসা। সরকার ও সেনাবাহিনীর স্বার্থ হানি হয় এমন কাজ করলে যে তাদের আঞ্চলিক পরিষদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ সত্যও তারা বেশ ভালোভাবেই জানেন। আর সে কারণেই দালালীর স্বাদ পাওয়া সন্তু লারমাকে মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এখন লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে সেনাবাহিনীর পদলেহন করতে হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা হারানোর ভয়ে তিনি ও তার গংরা চুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আস্ফালন করলেও আন্দোলনে নামেন না কখনো। কারণ তারা ভালো

৪র্থ পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ নেতা রঞ্জনমণি গ্রেফতার

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ গত ১ জুলাই পুলিশ জুরাছড়ি বাজারের পাশে একটি বাড়ি থেকে ইউপিডিএফ -এর একনিষ্ঠ কর্মি রঞ্জনমণি চাকমা ও সত্য প্রিয় চাকমাকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে তাদেরকে রাঙ্গামাটি জেলে আটক রাখা হয়েছে।
জানা যায়, ঐদিন তারা সাংগঠনিক কাজে বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ বাড়িতে গেলে দুই নাম্বারী বলে পরিচিত সন্ত্রাসীরা স্পাই -এর মতো তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য থানা প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। প্রথমে পুলিশ প্রশাসন কোন কারণ ব্যতিরেকে তাদেরকে গ্রেফতার করতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে টিএনও-র চাপাচাপিতে পুলিশ এ দুজনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আটক করে।
রঞ্জনমণি চাকমা জুরাছড়ি সুবলং এলাকায় কাজ চালিয়ে নতুন পার্টি ইউপিডিএফ এর ব্যাপক গণভিত্তি ও জনসমর্থন গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং এর ফলে সন্তু লারমা চক্র ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী সেখান থেকে উৎখাত হয়। দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিকভাবে ইউপিডিএফ'কে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে রঞ্জনমণি ও তার সহযোগিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় বলে এলাকাবাসীর ধারণা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
অপরদিকে, গত ২৪ জুলাই পুলিশ অনিমেষ চাকমা নামে ইউপিডিএফ -এর অপর এক কর্মিকে খাগড়াছড়ির দশ কিলোমিটার উত্তরে শিব মন্দির এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তাকে প্রথমে ৫৪ ধারায় আটক দেখালেও পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩০ দিনের আটকাদেশ দেয়। বর্তমানে সে খাগড়াছড়ি জেলে আটক রয়েছে। ❑

নান্যাচরে প্রশাসন ও সেনাদের সহযোগিতায় ভূমি বেদখলের কাহিনী

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ রাঙামাটি জেলার নান্যাচর থানার বুড়িঘাট এলাকায় ১১৩ নং তৈমিদুং মৌজায় জেলা প্রশাসন ও সেনা জোনের যৌথ ষড়যন্ত্রে জালিয়াতির মাধ্যমে ১৯৮৫/৮৬ সালে ১৫৩টি সেটেলার পরিবারকে ৬৯৫ একর ৭৫ শতক জমি বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে।
১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে সরকারের উদ্যোগে ১৫৩ টি সেটেলার পরিবারকে বুড়িঘাট এলাকায় আনা হয়। জেলা প্রশাসন ও ঘাগড়া সেনা জোন 'বুড়িঘাট পুনর্বাসন জোন' নাম দিয়ে পাহাড়িদের জমির উপর তাদের জোরপূর্বক পুনর্বাসন করার চেষ্টা চালায়। এ সময় মৌজার হেডম্যান স্বপন কুমার চাকমার নেতৃত্বে এলাকার জনগণ বাধা প্রদান করে। এতে সামরিক ও বেসামরিক উভয় প্রশাসন হেডম্যানের উপর ক্ষিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে প্রশাসন আপোষে যাবার চেষ্টা চালায় এবং হেডম্যানকে অর্থসহ বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়। তাতেও হেডম্যানকে দমিয়ে রাখতে না পেরে, পরে সেনারা ১৯৮৪ সালে তাকে গ্রেফতার করে। আর্মিরা তার উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং দীর্ঘ দিন বিনা বিচারে আটক রাখে।
হেডম্যান, সেনাদের অন্যায় অত্যাচার তথা পাহাড়িদের জমি বেদখলের হাত থেকে রেহায় পাবার জন্য তৎকালীন আত্মসমর্পনকারী শান্তিবাহিনী (প্রীতি গ্রুপের) নেতাদেরকে ঘটনাটি জানায় এবং সহযোগিতা কামনা করে। শান্তিবাহিনী নেতারা এতে সহযোগিতা করলে সাময়িকভাবে পুনর্বাসন বন্ধ থাকে।
এরপর সমস্যাটি আরো জটিল হয়। রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতায় ভূমি অফিসের তৎকালীন কানুনগো মো: শফিউল্ল্যাহ উক্ত হেডম্যানের অজান্তে তার সীলমোহর জাল করে ১৯৮৫/৮৬ সালে উক্ত ১৫৩টি সেটেলার পরিবারের নামে ৬৯৫.৭৫ একর পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে বন্দোবস্তি দিয়ে দেয়। পরে হেডম্যান সরকারের কাছে খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে দেখে খাজনার হিসাবে প্রত্যেক বছর গড়মিল হচ্ছে, তাকে জমির হিসাবের তুলনায় বেশী খাজনা আদায় করতে হচ্ছে। তখনও তিনি জানেন না ১৫৩টি সেটেলার পরিবারের নামে ৬৯৫.৭৫ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। হিসাবের গড়মিল বিষয়ে তিনি জানতে চাইলে অফিস থেকে বলা হয় পূর্বের হেডম্যানের ভুল হিসাবের কারণে এসব গড়মিল হচ্ছে। এ কথা শুনে তিনি গড়মিল বিষয়ে আর তেমন আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু দীর্ঘদিন পর, হেডম্যান খাজনা বৃদ্ধির রহস্য উদঘাটনের জন্য আবারো উদ্যোগী হয়ে রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুসন্ধান চালান। অনুসন্ধানের পর তিনি জানতে পারেন যে, ১৯৮৫/৮৬ সালে ১৫৩টি পরিবারের নামে জমি বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে। তিনি আরো দেখতে পান যে তার সিল মোহরটিও জাল করা হয়েছে। এতোদিন তিনি ইংরেজীতে বানানো সিল মোহর ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু সে বন্দোবস্তির কাগজ পত্রে বাংলা লেখার সিল মারা আছে। বন্দোবস্তির জবানবন্দি কপি তাকে না দিয়ে কৌশলে এতোদিন তার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হচ্ছিল।
হেডম্যান স্বপন কুমার চাকমা সম্পূর্ণ রহস্য উদঘাটন করতে করতেই বড়গাঙের পানি বহুদূর গড়িয়ে যায়। তিনি জালিয়াতির মাধ্যমে ভূমি বন্দোবস্তি দেয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া উপায়ও নেই। কারণ, দিনের পর দিন পাহাড়ীদের জায়গা জমি বহিরাগতদের দ্বারা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। কখনো জোরপূর্বক, কখনো জালিয়াতির মাধ্যমে আবার কখনো প্রতারণার মাধ্যমে এই বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে। প্রত্যেকটি সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে এ কাজ করেছে। ❑

ইউপিডিএফ নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র

কাউখালি প্রতিনিধি॥ কাউখালি থানায় ইউপিডিএফ-এর কয়েকজন নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে জেএসএস-এর স্থানীয় শাখার সদস্যরা। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই সেটি ফাঁস হয়ে গেছে। এলাকার সন্ত্রাসী জেএসএস-এর সহযোগি দুই নাম্বারী তপন চাকমা ইউপিডিএফ নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে সুরেশ চন্দ্র চাকমাকে নিয়োগ করে। সুরেশ চন্দ্র কাউখালী থানার অন্তর্গত ৯৪ নং নভাঙ্গা মৌজার তোনখেইয়্যা পাড়ার বাসিন্দা। তার পিতার নাম মৃত বাদী চাকমা। ইউপিডিএফ নেতাদের হত্যা করতে পারলে মোটা টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তপন চাকমা সুরেশ চন্দ্রের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য অগ্রীম এক হাজার টাকাও প্রদান করে বলে জানা গেছে। পরে চক্রান্তটি ফাঁস হলে স্থানীয় গণ আদালতের সামনে সুরেশ চন্দ্র সব স্বীকার করে। তিনি জানান, নেতাদের প্রাণনাশ করতে পারলে তাকে বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।এ ঘটনায় এলাকায় বেশ চাঞ্চলের সৃষ্টি করেছে।

আবার দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীদের আক্রমণ

দিঘীনালা প্রতিনিধি ॥ দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীরা দখলদার বাহিনীর মতো ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের ওপর আবার সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করেছে।

গত ১৪ জুলাই তারা বাবুছড়ার রাস্তার মাথা নামক এলাকায় হামলা চালায়। তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে গুলি করা হবে এবং বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা দুই মহিলাসহ গ্রামের ৫ নিরীহ লোকজনকে মারধর করে।

ফলে এলাকায় দুই নাম্বারীদের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। স্থানীয় জনতা এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দুই নাম্বারী বখাটে ছেলেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সংঘবদ্ধ হচ্ছে বলে জানা গেছে।

খাগড়াছড়িতে শ্লীলতা হানির চেষ্টা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি॥ গত ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টায় খাগড়াছড়ি সদরের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে মোহাম্মদ হোসেন এক মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে জনতার হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পরে ছেড়ে দেয়।

জানা যায়, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত উক্ত মহিলা (নাম প্রকাশ করা হলো না) সকালে কাজ করতে যায়। এ সময় লম্পট মোহাম্মদ হোসেন (৩৫) তাকে একা পেয়ে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। মহিলাটি চিৎকার করলে আশে পাশের লোকজন ছুটে আসে এবং ঐ লম্পটকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। গবেষণা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী তাকে জনতার হাত থেকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়। কিন্তু তাকে তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে না দিয়ে বা কোন প্রকার বিচারের ব্যবস্থা না করে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে মোহাম্মদ হোসেন উক্ত মহিলাকে নানান হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। কম বেতনে চাকুরীরত ত্রিপুরা সম্প্রদায় ভুক্ত উক্ত মহিলা ঘটনার পর অসহায় ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

উক্ত ঘটনা ও এতে নিরাপত্তা বাহিনীর রহস্যজনক ভূমিকা এলাকায় জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

দুই নাম্বারীদের গৃহবধূ অপহরণের চেষ্টা

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ আদর্শিকভাবে বিচ্যুত জেএসএস ও তাদের পেটোয়া বাহিনী সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীরা ২৪ আগস্ট রাঙামাটি সদরের হাজাছড়ার নোয়াআদামের এক গৃহবধূকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। পরে গণ প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা পালাতে বাধ্য হয়।

সেদিন দুই নাম্বারীরা দুপুর ২টায় মাতাল ও সশস্ত্র অবস্থায় ঐ গ্রামে প্রবেশ করে। তারা বীর কুমার চাকমার বাড়িতে গিয়ে স্বপ্না দেবী নামের এক গৃহবধূকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তার চিৎকারে গ্রামের লোকজন ছুটে আসে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দুই নাম্বারীরা ছুটে আসা লোকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তারপরও গ্রামের লোকজনের প্রতিরোধের মুখে দুই নাম্বারীরা ইঞ্জিন চালিত দেশীয় নৌকা যোগে পালাতে বাধ্য হয়। জানা যায়, দুই নাম্বারীরা তাদের এই কুকর্মে রাঙামাটি সদরের চক্রপাড়ার রনজিত মাস্টারের ইঞ্জিন চালিত নৌকাটি ব্যবহার করেছিল।

যারা এই অপহরণ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিল তাদের নাম পাওয়া গেছে। এরা হলো চিহ্নিত সন্ত্রাসী ধন্ন জয় চাকমা (খারিক্ষং পাড়া), বাবুল বড়ুয়া (চক্রপাড়া), অমৃত লাল (বাদলছড়ি), মঞ্জু বিকাশ দেওয়ান (রনজিত মাস্টারের ছেলে, চক্রপাড়া), তত্তুয়া (খারিক্ষং পাড়া) সহ মোট আট জন। ঘটনার পর গ্রামের লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। ❑

এলাকা সংবাদ

বিভিন্ন এলাকায় সেনা অপারেশন অব্যাহত

জনমনে আতংক বিরাজ করছে

কথিত সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃংখলা রক্ষার অজুহাতে জুন মাসে কাউখালী সাব-জোন আর্মি ক্যাম্পের মেজর সেলিম (৫০ বেঙ্গল) এবং সুবেদার রবের নেতৃত্বে কাউখালি এলাকায় সেনারা বেশ কয়েক বার অপারেশন চালায়। তারা পানছড়ি, উগুদো ছড়ি, উগলছড়ি, হাজাছড়ি, শুগুনো ছড়ি, পোড়া পাড়া, মুবাছড়ি ও নভাঙা গ্রামে হানা দেয়। মেজর সেলিমের নেতৃত্বে সেনারা পানছড়ি গ্রামে ঢুকে পড়লে সেখানে জনগণের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেনারা মধু মঙ্গল চাকমা (২৮), পিতা বার্তুজ্যা চাকমা নামে একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে সাংঘাতিকভাবে মারধর করে বলে বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়।

গত ৯ ও ১৪ আগস্ট মেজর সেলিম আবারো বড় ডলু পাড়া ও মাঝে পাড়ায় অপারেশন চালায়। মেজর সেলিম ও তার দল অহেতুক গ্রামবাসীদের হয়রানী মূলক জিজ্ঞাসাবাদ ও হুমকি প্রদান করে। পরে সেনারা ফেরার পথে ছয় জন নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে আসে। এরা হলেন, অংচাথুই মারমা (২৮) বড় ডলু পাড়া, থোয়াই চিংউ মারমা (২০) বড় ডলু পাড়া, থইশিনু মারমা (২৮) মাঝে পাড়া। বাকী তিন জনের নাম জানা যায়নি।

লক্ষ্মিছড়ি ॥ স্বাধিকারের লক্ষ্মিছড়ি প্রতিনিধি জানান, গত ১২ জুলাই লক্ষ্মিছড়ি জোন কমান্ডার লে: কর্ণেল মো: আবদুল ফিরোজ চৌধুরীর (২০ ফিল্ড আর্টিলারী) নেতৃত্বে এক দল সেনা দুই নাম্বারী বলে পরিচিত সন্ত্রাসীদের সহায়তায় মরাচেঙ্গী মুখ গ্রামে রাত ১১ টায় অপারেশন চালায়। সেনারা বাড়ি বাড়ি তল্লাসী চালায় এবং নিরীহ লোকজনদের হয়রানী করে। পরে তারা পাঁচ জন যুবককে ধরে নিয়ে এসে পুলিশের কাছে তুলে দেয়। এরা হলেন, ১. অনিল চাকমা (২৫) পিতা রবীন্দ্র চাকমা, ২. মতিলাল চাকমা (১৫) পিতা মরাইচ্যা চাকমা, ৩. তুংঙ্গা চাকমা (১৩) পিতা মরাইচ্যা চাকমা, ৪. প্রদীপ চাকমা (১৩) পিতা রঞ্জন মোহন চাকমা, ৫. গরীক চাকমা (১৪) পিতা মৃত পূণ্য সেন চাকমা। বর্তমানে তারা খাগড়াছড়ি জেলে আটক আছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও মুরুব্বীরা তাদের কোর্ট থেকে জামিনের চেষ্টা করলে উক্ত কমান্ডার তাদের হুমকি দিয়ে নিবৃত করার চেষ্টা চালায়।

যাদের সহযোগিতায় সেনারা এ অপারেশনে গিয়েছিল সেই দুই নাম্বারী সন্ত্রাসীরা হচ্ছে পাইচাখই মারমা, উসা খই মারমা, থোয়াই অং মারমা ও সাথোয়াই অং মারমা। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা থাকলেও তারা নিরাপত্তাবাহিনী পুলিশের সাথে ঘোরাফেরা করে।

গত ১৫ জুলাই উক্ত কমান্ডার লক্ষ্মিছড়ির ছোট ধ্রুং ঘাটে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অবৈধভাবে গাছ বাঁশ আটক করে রাখে। গাছ বাঁশ আটকের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তারা হলেন, শুকনাছড়ি পাড়ার এরিচন্দি চাকমা, হাজাছড়ি পাড়ার শরৎ চন্দ্র চাকমা, মরাচেঙ্গী পাড়ার প্রসেন চাকমা ও গনেশ চাকমা এবং ফটিকছড়ি রাজঘাটের বাসিন্দা ননা মিঞা। আটককৃত গাছের পরিমাণ আনুমাণিক ৩৫০ বর্গফুট ও বাঁশের পরিমাণ দুই হাজার টি।

জানা যায়, উক্ত সেনা কর্মকর্তা আটককৃত সকল গাছ স'মিলে নিয়ে গিয়ে চিড়ে পরে বর্মাছড়ি ইউনিয়নের শুকনাছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। শুকনাছড়ি ক্যাম্প সম্প্রসারণের জন্যই নাকি এ কাজ করা হয়েছে। এখনো গাছ আটকের ঘটনা ঘটছে বলে জানা গেছে।

লক্ষ্মিছড়ি এলাকায় অধিকাংশ জনগণ নিজেদের উৎপাদিত গাছ বাঁশ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সেনাদের এ ধরণের অন্যায় জবরদস্তির কারণে অনেক নিরীহ লোকজন বিপদে পড়েছেন। না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাদের। সেনা তৎপরতা বৃদ্ধি, গণ ধরপাকড় ও জোরজবরদস্তির কারণে এলাকায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

ঘাগড়া ॥ আমাদের ঘাগড়া প্রতিনিধি জানান, ঘাগড়া সেনা জোন এলাকায় সেনাবাহিনী ব্যাপক মাত্রায় অপারেশন চালাচ্ছে। সেনাদের তৎপরতা বৃদ্ধির কারণে সাধারণ জনগণের জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে এবং এলাকায় জনমনে ভীতি ও আতংক বিরাজ করছে।

গত ২৮ জুলাই শুক্রবার ঘাগড়া জোনের অধীন কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন শাকিল (৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনা দল হাজাছড়ি পাড়া ও চংড়াছড়ি পাড়ায় অপারেশন চালায়।

৫ আগস্ট সন্ধ্যায় শুকরছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে সুবেদার মো: কাবাজ (৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে ১৩/১৪ জনের অপর একটি সেনাদল শুকরছড়ি গ্রামে হানা দেয়। সেনাদের বেপরোয়া তৎপরতায় গ্রামবাসীরা আতংকিত হয়ে পড়ে।

৯ আগস্ট কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে ক্যাপ্টেন শাকিল (৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে সেনারা কুতুকছড়ি হেডম্যান পাড়ায় অপারেশন চালায়।

১০ আগস্ট কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে হাবিলদার তাহের (৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের সেনা দল হাজাছড়ি পাড়ায় প্রবেশ করে এবং স্কুলগামী ছাত্রীদের লক্ষ্য করে অশোভন মন্তব্য করে।

১৪ আগস্ট সোমবার মকছুদ টিলা আর্মি ক্যাম্প হতে সুবেদার কাদের(৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের এক সেনা দল কুতুকছড়ি মোনতলা পাড়ায় যায়। সেখানে জনৈক সেনা সদস্য লোকজনকে বলে যে, "এখানে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থী অনেকেই থাকে। তাদের ধরার জন্য আমরা এসেছি। সেজন্য ঘন ঘন অপারেশন চালাতে হয়।"

১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার হামিদ টিলা আর্মি ক্যাম্প হতে সুবেদার শাহজাহান (৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সেনা দল বামে তৈমিদুং পাড়ায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায়। একই দিন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জিওসি আবুল কায়সার ফয়জুল কবির ও রাঙামাটি জেলার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মো: রাব্বারী হেলিকপ্টার যোগে কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্পে যান। তাদের আগমণের পূর্বে কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর নেপতাহ (৫০ ইবিআর) আশেপাশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, কার্ব্বারীদের নির্দেশ দেয় যাতে তারা নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাম্পে হাজির হয়। কেউ এ নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হলে তাকে দেখে নেবেন বলেও তিনি হুঁশিয়ার করে দেন। ক্যাম্পে জিওসি ও ব্রিগেড কমান্ডার 'শান্তি চুক্তি' বিষয়ে সাফাই গেয়ে যান। পরে জিওসি জনদরদী সেজে আগতদের হাতে কম মূল্যের দেশীয় ঘড়ি, রেডিও, ছাতা ও গেঞ্জি তুলে দেন। সেনাবাহিনীর এ ধরণের কান্ডকারখানা দেখে এলাকার লোকজন হাসাহাসি শুরু করে।

১৯ আগস্ট শনিবার রাঙামাটি সদরের শুকরছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে সুবেদার কাবাজ (৫০ ইবিআর) এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল মরং ছড়ি ও খামার পাড়ায় অপারেশন চালায়।

২৫ আগস্ট শুক্রবার কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে মেজর নেপতাহ-র নেতৃত্বে ১২ জনের এক সেনাদল চেগেইছড়ি পাড়ায় হানা দেয়। তারা পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে রাত্রিযাপন করে এবং পরদিন ফিরে আসে।

২৬ আগস্ট শনিবার শুকরছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সুবেদার কাবাজ (৫০ ইবিআর)এর নেতৃত্বে সেনারা মরংছড়ি পাড়া, শুকরছড়ি পাড়া ও খামার পাড়ায় আবারো অপারেশন চালায়।

সেনাদের ঘন ঘন অপারেশন, তল্লাশি, বেপরোয়া ঘুরাফেরা এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করছে এবং জনমনে আতংক ও ভীতির সঞ্চার করেছে। ❑

সেনাবাহিনীর তল্লাশি অভিযানের নামে জবরদস্তি

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি॥ খাগড়াছড়ি সদর জোন হতে গত ২০ আগস্ট রবিবার সকাল সাড়ে সাত টার সময় একদল সেনা সদস্য ১১নং প্রকল্প গ্রামে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। সেনারা গ্রামবাসীদের সাথে কোন কথাবার্তা না বলে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায়। যাদের বাড়ি তল্লাশি চালানো হয় তাদের মধ্যে জ্যামিতি রঞ্জন চাকমা (৪০)-র বাড়িও রয়েছে। তল্লাশির পর কোন কিছু না পেয়ে সেনারা ফেরার সময় তার কাছ থেকে জোর করে ৫টি মুরগী নিয়ে আসে। সেনারা ৫টি মুরগীর দাম(?) দিয়ে আসে মাত্র ১২৫ টাকা যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪০০ টাকা। জ্যামিতি রঞ্জন মুরগী বিক্রি করতে চাননি। কিন্তু সেনারা তাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে নামমাত্র মূল্যে তাদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করে।

উল্লেখ্য, এই এলাকায় বহুদিন ধরে সেনারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। তারা কখনো তল্লাশির নামে আবার কখনো সন্ত্রাসী খোঁজার নামে গ্রামবাসীদের হয়রানি করে থাকে। ফেরার পথে জোর করে নিয়ে আসে পাহাড়িদের ফলমূল, মুরগী সহ নানা কিছু। অসহায় গরীব খেতে খাওয়া পাহাড়িরা ভয়ে এর কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ফুসে উঠছে। সেনাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ দ্রুত দানা বাঁধতে শুরু করেছে। যে কোন সময় এর বিস্ফোরণ ঘটলে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। কোন মানুষ দীর্ঘদিন এ ধরনের অন্যায় অত্যাচার ও জোর জুলুম সহ্য করতে পারে না। সেনাদের এ ধরনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

অপহৃত মেয়েকে উদ্ধারের জন্য মায়ের আকুল আবেদন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ॥ দুর্বৃত্তদের হাতে অপহৃত মেয়েকে উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন মানিকছড়ি থানাধীন কালাপানি গ্রামের বাসিন্দা ক্যজপ্রু মারমা। জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া এক আরজিতে তিনি বলেন, গত ২৮ নভেম্বর ১৯৯৯ দুর্বৃত্তরা দা, ছেনি ও লাঠিসোটা নিয়ে তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার ১৪ বছরের মেয়ে জুনিমা মারমাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই পর থেকে তার কোন হদিস মেলেনি।

তিনি আরো জানান, "আমি নিরুপায় হইয়া মানিকছড়ি থানায় এজাহার এবং অভিযোগ দায়ের করি। এমনকি লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার বরাবর পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিগত ২৮/১১/৯৯ ইং তারিখ হইতে অদ্যাবধি কোন আসামীকে [গ্রেফতার করা হয় নাই] এবং আমার ১৪ বছরের মেয়েকে উদ্ধার করিতে পারে নাই।" দুর্বৃত্তরা বর্তমানে থানায় দায়েরকৃত এজাহার তুলে নেয়ার জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং তা না করলে তাকে মেরে ফেলবে বলেও হুমকি দিচ্ছে। তিনি তার মেয়ে জুনিমা মারমাকে উদ্ধার এবং অপহরণকারী দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে আইনানুগ শাস্তি প্রদানের আবেদন জানান।

ডিসিকে দেয়া স্মারকলিপি বা আরজিতে তিনি অপহরণকারীদের নামও উল্লেখ করেন। এরা হলো ১. মোঃ বাবুল মিয়া পিতা কুদ্দুস মিয়া গ্রাম যোগ্যছোলা, ২. মোঃ আমীর হোসেন পিতা জমসের আলী গ্রাম যোগ্যছোলা, ৩. মোঃ মনির হোসেন পিতা আঃ কাদের গ্রাম কালাপানি, ৪. মোঃ রশিদ পিতা আঃ কাদের গ্রাম কালাপানি, ৫. মোঃ আবু তাহের পিতা আঃ হামিদ গ্রাম কালাপানি, ৬. মোঃ আঃ মান্নান পিতা গণি মিয়া গ্রাম কালাপানি, ৭. মোঃ আঃ বারেক পিতা অজ্ঞাত গ্রাম কালাপানি, ৮. দুলাল বড়ুয়া পিতা সাধন বড়ুয়া গ্রাম কালাপানি, ৯. তাতু ত্রিপুরা পিতা দীনবন্ধু ত্রিপুরা গ্রাম কালাপানি, ১০. ইয়াতু ত্রিপুরা পিতা অজ্ঞাত গ্রাম নোয়াবিল এবং ১১. মোঃ হাবিব পিতা আলী আহম্মদ, মেম্বার পিলখানা নারায়ণ হাট ইউনিয়ন ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

স্বাধিকার পড়ুন
পার্বত্য চট্টগ্রামের
সাম্প্রতিক পরিস্থিতি
জেনে নিন।

ফিরে দেখা

চুক্তি বিষয়ে স্বাধিকারের বক্তব্যের মূল্যায়ন

অখিল চাকমা

একবার ঋসির রাজা গোপাল ভাঁড়ের গরু হারিয়ে মতিভ্রম হয়েছিল। মতিচ্ছন্ন হয়ে নিজের ছেলেকে গোপাল ভাঁড় শালা বলে গালি দেয়। এটা শুনে লজ্জায় ঠোঁট কেটে তার বউ বলে উঠল, মানুষের মাথা খারাপ হয় বলে নিজের ছেলেকে কেউ কোনদিন শালা বলে গালি দেয় নাকি? গোপাল ভাঁড় থতমত খেয়ে অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, গরু হারালে সবার এমন হয়, মা।

প্রত্যেক পত্রিকা একটা নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে এবং তার ভিত্তিতে চলে। ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র 'স্বাধিকার'ও একটি নীতিমালা অনুসরণ করে। পূর্বে 'স্বাধিকার' পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন' এর মুখপত্র ছিলো। এ তিন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ইউপিডিএফ গঠিত হওয়ার পর এটি ইউপিডিএফ এর মুখপত্র হয়ে যায়। যেহেতু ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক দল, তাই 'স্বাধিকারে' জুম্ম জনগণের মতামত ও আশা আকাংখ্যা প্রতিফলিত হবেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে 'পার্বত্য চুক্তি' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চুক্তি বিষয়ে শুরু থেকেই 'স্বাধিকারের' বক্তব্য ও নীতিগত অবস্থান সুস্পষ্ট। আজকের এ আলোচনায় 'স্বাধিকার' চুক্তির পূর্বে চুক্তি বিষয়ে কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো, জনগণকে কী বলে সতর্ক করে দিয়েছিলো তার মূল্যায়ন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপতে সে সময়ের 'স্বাধিকারের' বক্তব্য কতটুকু সুদূরপ্রসারী ছিল তা পরিস্কার হবে। কোন একটি ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই কঠিন কাজ। তবুও 'স্বাধিকার' তার নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে সে সময়কার পরিস্থিতি ও আসন্ন চুক্তির বিষয়ে নিজস্ব মতামত রেখেছে, জনগণের কাছে বক্তব্য দিয়েছে। মনে রাখতে হবে ঘটনা ঘটার পর ঘটনাটা যতটা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় বুঝা যায়, ঘটনার পূর্বে ততটা অস্পষ্ট ও ঘোলাটে থাকে। তাছাড়া সরকার, জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তো সবসময় চাপ হুমকি ছিলো। চুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলা রীতিমত ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেই পরিস্থিতিতেও 'স্বাধিকার' থেমে থাকেনি। তখন 'স্বাধিকারের' অনেক সীমাবদ্ধতা ও তীব্র অর্থ সংকটের কারণে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। তাই সময় যেভাবে গড়িয়েছিলো সেভাবে বিশ্লেষণ নিয়ে জনগণের কাছে হাজির হতে পারেনি। এ সব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও 'স্বাধিকার' তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে পাঠকের পাশে থেকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এবার সেগুলি মূল্যায়ন করা যাক-

বুলেটিন নং- ৩,
প্রকাশ কাল ৩০ ডিসেম্বর'৯৬।

এ সংখ্যায় লিড ছিলো- **'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান: আশা- আশংকা'**। বুলেটিনটি প্রকাশিত হওয়ার আগে ২১ ও ২৪ ডিসেম্বর দু দফায় আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজের বৈঠককে ফলপ্রসু, অর্থবহ, নতুনত্ব ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছিলেন। অন্যদিকে সংবাদপত্রে ফলাওভাবে ছাপা হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ব্যাপক আশাবাদ, বৈঠকের খোঁজ খবর নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অসুস্থ লারমাকে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অথিতি ভবনে রেখে চিকিৎসার প্রস্তাব, জাতীয় কমিটির নেতারা জেএসএস নেতাদেরকে ধুধুকছড়া পর্যন্ত air lift দেওয়া, প্রেস ব্রিফিং-এ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আগামী বৈঠকে সরকারের 'রূপরেখা' দেয়ার আশাবাদ ইত্যাদি নানান ধরণের শ্রুতিমধুর কথাবার্তা। এই পরিস্থিতিতে 'স্বাধিকার' উপরেল্লিখিত শিরোনাম দিয়ে লিখে, *... পার্বত্য চট্টগ্রামের "অস্থির অশান্ত এই অধ্যায়টির" যবনিকা টানতে হলে, অতি অবশ্যই যথার্থ রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।* আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, *... খেয়াল রাখতে হবে যে, লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে 'জেলা পরিষদ' ব্যবস্থাকে যদি ঘষামাজা করে চটকদার মনোহারী নামের লেভেল এঁটে দিয়ে 'রাজনৈতিক সমাধান' হিসেবে বাজারে চালিয়ে দিতে চাইলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ... অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে পাহাড়ীরা দেখেছে যে, সমাধানের লক্ষ্যে বৈঠক 'ফলপ্রসু' 'সন্তোষজনক' হওয়াটা যথেষ্ট নয়। তার কারণ, বৈঠক 'সন্তোষজনক' 'ফলপ্রসু' হবার পরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারেনি। শুধু দফায় দফায় বৈঠকের নামে কালক্ষেপন হয়েছে। কাজেই অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে, বৈঠকের অনেক আনুষ্ঠানিকতা যেমন ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা, কোলাকুলি, উপহার দেওয়া, সৌহাদ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনা, রকমারী খানা পিনা, এবং বৈঠকের শেষে দেয়া 'উচ্ছসিত বক্তব্যকে' পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আর বড় কথা বলে মনে করতে পারে না।* এ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, *... স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম অক্টোবর মাসের ('৯৬) প্রথম দিকে খাগড়াছড়িতে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ কালে স্বীকার করেন, সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নেই। ... কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এতে কিভাবে যে অনেকে 'নতুনত্ব খুঁজে' পান তা সত্যি বুঝা দায়।* এ সম্পাদকীয়তেই সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, *... এটা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই এবং সরকারকে অনুধাবন করতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে। এছাড়া অন্যকিছু জুম্ম জনগণের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে না।*

বুলেটিন নং -৪,
প্রকাশ কাল ২০ ফেব্রুয়ারী'৯৭।

এ সংখ্যার লিড ছিলো-**'অবিলম্বে জনগণের ন্যায্য দাবি মেনে নিন'**। এ সময়ে সরকার ও গণমাধ্যম দেখাতে চাচ্ছিলো খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ থেকে বৈঠকের স্থান ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়াকে 'আরো এক ধাপ অগ্রগতি' হিসেবে। দৈনিক পত্রিকাগুলো ধুধুকছড়ায় মানুষের ভীড়, মিলন মেলা, উৎসবের ঢল নামার গল্প প্রচার করে। অথচ পত্রিকা গণমাধ্যমগুলি বৈঠকে সরকারের যে রূপরেখা দেয়ার কথা ছিলো তা দিয়েছে কিনা কোন রিপোর্ট ছাপেনি। সব চেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে, সন্তু লারমা ধুধুকছড়া থেকে উড়ে এসেছেন ঢাকায় বৈঠকে বসতে। বৈঠক শেষে ফেরার পথে ঢাকার পুরাতন বিমান বন্দরের হেলি প্যাডে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ বিদায় জানান সন্তু লারমাকে 'মুজিব কোট' পরিয়ে দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে 'স্বাধিকারের' স্পষ্ট বক্তব্য ছিলো- *শান্তি প্রক্রিয়ার সদিচ্ছা স্বরুপ সরকারের কোন উদ্যোগ এখনো দেখা যাচ্ছে না। সরকারের ভূমিকা রহস্য জনক।* সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, *... গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বিবিসি'র সাথে সাক্ষাতকারে সেনাবাহিনী ও বহিরাগতদের সম্পর্কে প্রদত্ত জে: নূরুদ্দীন খানের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিগত স্বৈরাচারী এরশাদ ও খালেদা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিগত বিষয়ের সাথে বর্তমান সরকারের কোন পার্থক্য নেই'।* সম্পাদকীয়তে হাটে বাজারের 'ব্যাপারীদের' উদাহরণ দিয়ে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে আরো বলা হয়, *... আওয়ামী লীগও সামান্য কিছু রাজনৈতিক ছাড় দিয়ে এবং লোক দেখানো বাহ্যিক আন্তরিকতা, চাকচিক্য দেখিয়ে জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে কানাগলিতে টেনে নেবার ষড়যন্ত্র করছে। ... জনগণ সরকারের ফাঁদে পা দেবে না। ... কিছু উচ্ছিষ্ট পাওয়ার লোভে তারা সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে সমাধানের জারীগান গাইছে। জনগণকে এদের ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।*

বুলেটিন নং - ৫,
প্রকাশ কাল ১০ এপ্রিল '৯৭।

এ সংখ্যাটিতে ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির ভিত্তিতে ভারত থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের বিষয় স্থান পায়। এ বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যও ছাপা হয়েছে। যা এ আলোচনার বিষয় বস্তু নয়। তবে এ সংখ্যায় চলমান বৈঠক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ে দুটি লেখা ছাপা হয়েছে।

বুলেটিন নং - ৬,
প্রকাশ কাল ১০ জুন '৯৭।

এ সংখ্যার লিড হচ্ছে- **'আসন্ন চুক্তি: অধিকার প্রতিষ্ঠা না জলাঞ্জলি?'**। এ সংখ্যা বেরুবার আগে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। পত্রিকায় প্রথমে বেরিয়েছে চতুর্থ দফা বৈঠকের তৃতীয় দিনেও সরকার ও জনসংহতি সমিতি ঐক্যমত্য না হওয়ায় যৌথ প্রেস ব্রিফিং হয়নি। পরে চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত পত্রিকা দৈনিক পূর্বকোণ -এ ১৫ মে তারিখে সংবাদ ছাপায়, সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির চতুর্থ বৈঠকের প্রথম দিনে সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও গৌতম চাকমা উপস্থিত থাকলেও, ১৪ মে দুপুরের পর কেবল চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ ও সন্তু লারমা একান্তে বৈঠক করেন। তারা সকল বিষয়ে খুব সহজেই একমত হন। ১৬ মে ডেইলি স্টার ছাপায়, অবশেষে সরকার ও জেএসএস এর মধ্যে 'সকল বিষয়ে ঐক্যমত্য' প্রতিষ্ঠিত হয়ে অতি শীঘ্রই চুক্তি হতে যাচ্ছে। সরকারের সাথে বোঝাপড়া শেষে ১৫ মে ধুধুকছড়ায় ফিরে জেএসএস নেতৃবৃন্দ জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেননি। সাংবাদিকদেরও থাকতে দেয়া হয়নি। যা আগের নিয়মের ব্যতিক্রম।

চুক্তি বিষয়ে শুরু থেকেই 'স্বাধিকারের' বক্তব্য ও নীতিগত অবস্থান সুস্পষ্ট। আজকের এ আলোচনায় 'স্বাধিকার' চুক্তির পূর্বে চুক্তি বিষয়ে কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো, জনগণকে কী বলে সতর্ক করে দিয়েছিলো তার মূল্যায়ন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপতে সে সময়ের 'স্বাধিকারের' বক্তব্য কতটুকু সুদূরপ্রসারী ছিল তা পরিস্কার হবে। কোন একটি ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই কঠিন কাজ। তবুও 'স্বাধিকার' তার নিজস্ব নীতিমালার ভিত্তিতে সে সময়কার পরিস্থিতি ও আসন্ন চুক্তির বিষয়ে নিজস্ব মতামত রেখেছে, জনগণের কাছে বক্তব্য দিয়েছে। মনে রাখতে হবে ঘটনা ঘটার পর ঘটনাটা যতটা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় বুঝা যায়, ঘটনার পূর্বে ততটা অস্পষ্ট ও ঘোলাটে থাকে।

বিভিন্ন পত্রিকা থেকে চুক্তি বিষয়ে 'স্বাধিকার' যা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তা তুলে ধরে। সে সময় পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট বের হয় যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যা ঐকমত্য হয়েছে তাতে জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি নেই, জনসংহতি সমিতি বর্তমানের মত অবস্থানে থাকলেও শান্তিবাহিনী ভেঙে দেয়া হবে, শান্তিবাহিনী অস্ত্র জমা দেবে, অপ্রয়োজনীয় সামরিক ক্যাম্প তুলে নেয়া হবে তবে বর্তমান ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো বহাল থাকবে, সেটেলার প্রশ্নে সমিতি ... যে দাবি তুলেছিল তা থেকে সরে এসেছে, ...ভূমি প্রসঙ্গে জাতীয় কমিটির আশ্বাস সমিতি মেনে নিয়েছে ইত্যাদি। এ সময় স্বাধিকার থেকে প্রশ্ন তুলে মন্তব্য করা হয়, *... সেই ভিত্তিতে যদি জনসংহতি সমিতি চুক্তি সম্পাদনের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভাগা মানুষের জনসংহতি সমিতিকে কিছু বলার আছে।* আরেক জায়গায় বলা হয়, *... ভূমি অধিকার নিরাপত্তা সহ ইত্যাদি বিষয়ে জনসংহতি সমিতিকে জনগণের কাছে জবাব দিহি করতে হবে।* অন্য এক জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত-কে তাদের নোংরা রাজনীতি নিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়।

এ সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা হয় এ শিরোনামে- **'নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব এবার পার্বত্যবাসীদের নিজেদেরই'**। মাইচছড়ি বাজারের ঘটনা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জমি ফেরত না পাওয়া, নিজেদের নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে জুম্মদের প্রতি আহ্বান জানায়, *... দুর্ভাগা মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হলে, তার সমুচিত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।*

বুলেটিন নং -৭,
প্রকাশ কাল ২০ আগষ্ট '৯৭।

এ সংখ্যার লিড হচ্ছে- **'আন্দোলন নস্যাতের পাঁয়তারা, ছাত্র জনতা রুখে দাঁড়ান'**। এতে ও সম্পাদকীয়তে সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল, ধান্দাবাজ, সরকারের চরদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এবং সমাজে ছাত্র-জনতার কি দায়িত্ব কর্তব্য তা তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ ধ্বংসের সকল পাঁয়তারাকে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

বুলেটিন নং -৮,
প্রকাশ কাল ৮ নভেম্বর '৯৭।

এ সংখ্যার শিরোনাম হচ্ছে- **'আপোষ নয়, আসুন লড়াই সংগ্রাম জোরদার করি'**। একটি গল্প দিয়ে লেখাটি শুরু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ভাঁড়েদের চিনবার, বুঝাবার জন্য গল্পটি খুবই উপযুক্ত ছিলো। গল্পটি হলো, *একবার ঋসির রাজা গোপাল ভাঁড়ের গরু হারিয়ে মতিভ্রম হয়েছিল। মতিচ্ছন্ন হয়ে নিজের ছেলেকে গোপাল ভাঁড় শালা বলে গালি দেয়। এটা শুনে লজ্জায় ঠোঁট কেটে তার বউ বলে উঠল, মানুষের মাথা খারাপ হয় বলে নিজের ছেলেকে কেউ কোনদিন শালা বলে গালি দেয় নাকি? গোপাল ভাঁড় থতমত খেয়ে অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, গরু হারালে সবার এমন হয়, মা।*

গল্পটি দিয়ে রাজনৈতিকভাবে মতিচ্ছন্ন জেএসএস-কে গোপাল ভাঁড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ লেখায় সমাজের বদমায়েশ, সুবিধাবাদী, দালালদের সাথে জাতীয় ঐক্যমত্যের ডাক আর প্রকৃত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হামলা, মারধরের সমালোচনা করা হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ বৈঠক শেষে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের জনৈক কর্মকর্তার ধরে দেয়া এক চিরকুট ধরে সন্তু লারমা ২১ সেকেণ্ডের এক সংক্ষিপ্ত প্রেস বিফিং এ বলেন, খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। আমরা সহকর্মিদের সাথে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি সই করতে যাচ্ছি। অথচ ৩১ অক্টোবর সরকারের কাছে খসড়া চেয়ে সমিতি চিঠি পাঠায়। এ বৈঠকের পর বিভিন্ন জনসভা, সাক্ষাৎকার, আলোচনা সভায় সরকার স্পষ্ট ঘোষণা করে, সেনাবাহিনী সেটেলার প্রত্যাহার করা হবে না, সংবিধান পরিবর্তন করা হবে না। অপরপক্ষে জনসংহতি সমিতির এমন ভাবসাব যেন "চুক্তিতে জুম্মদের স্বার্থ নিহিত রয়েছে, তবে কি কি বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছে তা এখন জনসমক্ষে বলা যাবে না"। 'স্বাধিকারে' সমিতির এ ভুমিকা নিয়ে এবং চুক্তির বিষয় নিয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহ পোষণ করা হয়। অনেক লেখায় জেএসএস-এর সমালোচনাও করা হয়।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তির আগ পর্যন্ত 'স্বাধিকারের' ছয়টি সংখ্যা বেরিয়েছে। সীমিত ভাবে হলেও 'স্বাধিকার' পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি, বৈঠক, চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে। 'স্বাধিকারের' সে সময়ের মূল্যায়নের সাথে বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির কতটুকু মিল বা অমিল তার বিচারের ভার পাঠকের কাছেই রইল। ❑

২৪.৮.২০০০

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ ❑ বুলেটিন নং ১৬

দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

গত ১৮ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলাধীন ভীমপুর নামক এক সাঁওতাল পল্লীতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার এক নেতা আলফ্রেড সরেনকে জোতদারের লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী মধ্যযুগীয় কায়দায় নৃশংসভাবে খুন করে। এ ঘটনা দেশের পত্র পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

পত্র পত্রিকায় জানা যায়, প্রায় ২০০ জনের একটি গুণ্ডাবাহিনী ঐদিন এ ঘটনা ঘটায়। তাদেরকে হাতেম আলী ও সীতেশ চন্দ্র ওরফে গদাই নামে দু'জন জোতদার ভাড়া করে সংখ্যালঘু গ্রামবাসীদের জমি দখল করার জন্য লেলিয়ে দেয়। গুণ্ডারা তিন ঘন্টা ধরে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট চালায়। সরেনকে হত্যা করার পরও তারা ক্ষান্ত হয়নি। ১৭টি পরিবারের ২২ ব্যক্তিকে তারা জোর করে একটি বাড়িতে ঢুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনার সময় খগেন নামে একজন সাঁওতাল ২ কিলোমিটার দূরে নাওহাট পুলিশ স্টেশনে গিয়ে খবর দেয়। কিন্তু পুলিশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসাতো দূরের কথা, তারা খগেনকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত থানায় আটকিয়ে রাখে। আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার লোকজন এ খবর জানার পর সাহায্যের জন্য ভীমপুর গ্রামের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ তাদেরকেও আটকিয়ে রাখে। ফলে জোতদারদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে তাদের নারকীয় ধ্বংসলীলা চালাতে সক্ষম হয়। সম্প্রতি পত্রিকায় বেরিয়েছে যে হাতেম ও গদাই বাহিনী পুলিশের সম্মতি নিয়েই আতিবাসীদের উপর ঐ আক্রমণ সংগঠিত করেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের কোন সীমা পরিসীমা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের দমন পীড়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী সরাসরি দায়ি। অপরদিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত গারো, মুনিপুরী, সাঁওতাল, খাসিয়া ইত্যাদি আরো অনেক জনগোষ্ঠির ওপর নির্যাতনের চিত্র কিছুটা ভিন্ন, তবে নির্যাতনের মাত্রা মোটেই কম নয়। এই নির্যাতনের মাত্রা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও নির্যাতনের উদ্দেশ্য কিন্তু একই- তা হলো সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা।

আলফ্রেড সরেনকে গুণ্ডারা আঘাত করে ভূপাতিত করলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাকে মেরো না, আমি জমি চাই না, আমি বাঁচতে চাই। আমার হাত অথবা পা কেটে নাও, তবুও আমাকে মেরে ফেলো না, আমাকে বাঁচতে দাও"। কিন্তু তার এই আকুল আবেদন গুণ্ডাদের পাষাণ হৃদয় গলাতে পারেনি। তারা সরেনকে পশুর মতো জবাই করে হত্যা করে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের কোন সীমা পরিসীমা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের দমন পীড়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী সরাসরি দায়ী। অপরদিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত গারো, মুনিপুরী, সাঁওতাল, খাসিয়া ইত্যাদি আরো অনেক জনগোষ্ঠির ওপর নির্যাতনের চিত্র কিছুটা ভিন্ন, তবে নির্যাতনের মাত্রা মোটেই কম নয়। এই নির্যাতনের মাত্রা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকলেও নির্যাতনের উদ্দেশ্য কিন্তু একই- তা হলো সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের সংগঠিত প্রতিরোধ সংগ্রামের কারণে সেখানকার খবর কিছুটা হলেও দেশের পত্র পত্রিকায় ও দেশের বাইরে প্রচারিত হয়ে থাকে। যদিও প্রায় সময় অনেক ঘটনা বিকৃতভাবে দেশের পত্র পত্রিকায় প্রচারিত হয় অথবা আদৌ প্রচারিত হয় না। কিন্তু এ ধরনের আন্দোলন অপরাপর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিগুলোর এলাকায় না থাকায় এবং পত্র পত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করায় তাদের অত্যাচার অবিচারের কথা দেশবাসী প্রায়ই জানেন না।

এখন সময় এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম সংঘটিত করার। যে সরকার ও রাষ্ট্র শোষক ও নিপীড়নকারী তার কাছে অনুনয় বিনয় করে অধিকার অর্জিত হতে পারে না। একমাত্র নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমেই অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়।

এখন সময় এসেছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করার। যে সরকার ও রাষ্ট্র শোষক ও নিপীড়নকারী তার কাছে অনুনয় বিনয় করে অধিকার অর্জিত হতে পারে না। একমাত্র নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমেই অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়। ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল জাতিসত্তাসমূহের ঐক্যকে ধারণ করে তথাকথিত শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ইউপিডিএফ অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাথেও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম গড়ে তুলতে প্রস্তুত রয়েছে।

চিঠিপত্র

জেএসএস-এর অবস্থান পরিস্কার হওয়া দরকার

কথায় বলে বৃক্ষের পরিচয় ফলে। সেটিকে একটু ভিন্নভাবে বললে বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোকে চেনা যায় তার রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মসূচীতে। জুম্ম জনগণ গভীর উদ্বেগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। কোন দল কী বক্তব্য ও কর্মসূচী নিয়ে এগুচ্ছে তা দেখার বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের এক কালের বৃহৎ সংগঠন জনসংহতি সমিতি যেন সে দিক থেকে পিছিয়ে আছে। চুক্তি, চুক্তির পর আত্মসমর্পন ও আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা গ্রহণ ইত্যাদির পর সমিতির বক্তব্য সঠিক কি তা বুঝা মুস্কিল। আসলে যতই ক্ষমতার কাছাকাছি যাচ্ছে ততই তাদের বক্তব্য অস্পষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় সমিতিকে সরকার বিরোধী কথা বলতে শোনা যায়। আবার আরেক ক্ষেত্রে সন্তু লারমাদের বলতে শোনা যায় সরকারের উপর তাদের অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। সমিতির এ ধরনের লেজে গোবরে অবস্থার কারণ কি? এ ধরণের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কি সমিতির কৌশল?

পি. আর. খীসা
বাঘাইছড়ি

দালাল দি গ্রেট সন্তু লারমার সেনা তোষণ

১ম পাতার পর

ভাবেই জানেন, তারা সরকারের মর্জি মাফিক আঞ্চলিক পরিষদে ফেলে দেয়া ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট চাটছেন। সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে সরকার তাদেরকে লাথি মেরে বের করে দেবে। কিন্তু সন্তু লারমা ও তার গংরা কোনমতেই সরকারের দেয়া সুযোগ সুবিধা ছাড়তে রাজী নয়। সে কারণে দুই বছর আগে রাঙামাটি স্টেডিয়ামে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য রক্ত দেয়ার শপথ নিলেও সন্তু লারমারা আজ পর্যন্ত কোন আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়নি। বরং সরকারকে খুশী ও লাভবান করার জন্য তারা জনগণ ও ইউপিডিএফ-এর ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

জনগণের কিছু অংশকে বিভ্রান্ত করার জন্য নব্য দালাল সন্তু লারমার কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, তিনি বহু বছর হয় জঙ্গলবাস না হয় হাজত বাস করেছেন। আন্দোলন কতটুকু করেছেন বা সঠিকভাবে করতে পেরেছেন সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে এর ফলে তার পক্ষে সংগ্রামী লেবাস ধারণ করতে সহজ হয়, যা সমীরণ দেওয়ান কিংবা কুখ্যাত দাজ্যা ভূবন্যা ও অন্যান্য দালালদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, তিনি সরকারের সাথে যে চুক্তি করেছেন তাতে জনগণের স্বার্থ না থাকলেও আওয়ামী লীগ সরকারের দালাল বুদ্ধিজীবীরা সেই চুক্তিকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সমর্থন দেয়। তৃতীয়ত, সন্তু লারমা অন্য দালালদের চাইতে অনেক বেশী ধূর্ত এবং তার দালালীর কৌশলও অনেক সুক্ষ। একদিকে তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের কৃপাভাজন হওয়ার জন্য বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তার অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। আবার অন্যদিকে সময়ে সময়ে সরকারকে আন্দোলনেরও হুমকি দিয়ে থাকেন। তার এই দ্বৈত নীতি পরস্পর বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা অর্থাৎ সরকারের ওপর আস্থা থাকলে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করতে হবে কেন? আর, আন্দোলনের হুমকি দিয়েও কেন তিনি আন্দোলনের কোন কর্মসূচী দেন না? এই ধরণের কর্মসূচী না দেয়ার কারণ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তু লারমারা আঞ্চলিক পরিষদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে। সরকার যখন ইচ্ছে তখন তাদেরকে বরখাস্ত করতে পারেন। সরকারের এই বরখাস্ত করার ইচ্ছা তখনই জাগ্রত হবে যখন জেএসএস চুক্তি বাস্তবায়ন বা অন্য কোন দাবিতে আন্দোলনে গিয়ে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। সেজন্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে বরখাস্ত হওয়া ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হারানোর ভয়ে সন্তু লারমারা নিজেরা এমনকি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন থেকে একশত হাত দূরে রয়েছেনই, উপরন্তু যারা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাদেরকে বিভিন্নভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সহযোগিতায় বাধাগ্রস্থ করছেন। কিছুদিন আগে ঢাকা কুরিয়ার নামক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, সরকার ও জেএসএস -এর মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা মোতাবেক সরকার জেএসএস-কে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি আসনের একটি ছেড়ে দেবে। আওয়ামী লীগের সাথে সন্তু চক্রের দহরম মহরম ও নির্বাচনী সমঝোতা নতুন নয়। আর কেবল নির্বাচনী সমঝোতা নয়, জনগণের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ফসল ইউপিডিএফ -কে নির্মূল করার জন্য সন্তু চক্রের সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সমঝোতাও হয়েছে।

ইউপিডিএফ জনগণের ন্যায় সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য দালালি পরিহার করে জনগণের সাথে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সন্তু চক্রকে বার বার আহ্বান জানিয়ে আসছে। ইউপিডিএফ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেরও প্রস্তাব দিয়েছে। সর্বস্তরের জনগণও চায় উভয় পার্টির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হোক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠুক। কিন্তু সন্তু চক্র ইউপিডিএফ-এর এই আহ্বান ও জনগণের আকাংখার জবাব দিয়েছেন একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ও জনগণের ওপর দখলদার সেনাবাহিনীর মতো দমন পীড়ন চালিয়ে। সম্প্রতি (৮ই সেপ্টেম্বর) সন্তু চক্রের সন্ত্রাসী বাহিনী পানছড়ির লোগাং এলাকায় গুলি করে ইউপিডিএফ -এর দু'জন কর্মিকে হত্যা করে এবং অন্য ৬ জনকে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনা প্রমাণ করে ইউপিডিএফ যতবেশী ও যত মাত্রায় ঐক্যের ডাক দেয় এবং যতই আলোচনা বৈঠকের উদ্যোগ চলতে থাকে ততই সন্তু চক্র ইউপিডিএফ ও জনগণের ওপর তাদের আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে থাকে। এতে যে কেবল জনগণের শত্রুদের লাভ হয় তা বোধ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই জানেন। অনেকে বিভিন্ন সময়ে সন্তু চক্রের এই চরম জাতি বিধ্বংসী কর্মকান্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাকে এই আত্মঘাতি সংঘর্ষ বন্ধ করে আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদের প্রত্যেককে কড়া ভাষায় শাসিয়েছেন ও হুমকি দিয়েছেন।

আসলে সন্তু চক্র সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন ঠেকানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে ঠিকাদারি লাভ করেছেন। আর এই আন্দোলনের শক্তি হিসেবে ইউপিডিএফ -কে নির্মূল করার জন্য তিনি এখন উঠে পড়ে লেগেছেন। শুধু ইউপিডিএফ-এর কর্মিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ নয়, সাধারণ জনগণের ওপরও সন্তু চক্রের সন্ত্রাসী বাহিনী দমন পীড়ন চালাচ্ছে। পানছড়িতে ইউপিডিএফ -এর কর্মিদের আত্মীয় স্বজনদেরকে তারা বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। ইউপিডিএফ -এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে অস্ত্র কেনার জন্য সেখানে চাকুরীজীবীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছে। সেনাবাহিনীর কায়দায় পানছড়ি বাজারে আসা লোগাং পুজগাং এলাকার লোকজনকে তাদের মালপত্র তল্লাশির নামে হয়রানি করছে। তাদেরকে চাঁদা না দিয়ে কোন মাল বোঝাই গাড়ি পুজগাং-এর দিকে যেতে পারে না। সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের এসব কাজে মদদ দেয়া হচ্ছে। শুধু পানছড়ি নয়, অন্যান্য এলাকায়ও সাধারণ লোকজন সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের উৎপাতে শান্তিতে থাকতে পারছেন না। কয়েক মাস আগে নালকাটা এলাকা থেকে সাতটি পরিবারকে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। তাদের অপরাধ তারা আপোষ চুক্তিকে ও সন্তু লারমার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সমালোচনা করেছিলেন। সন্তু লারমা এতবেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন যে, জেএসএস -এর মধ্যে যারা আত্মঘাতি সংঘাতের পক্ষপাতি নয় এবং যারা এখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন তাদের ওপরও তিনি চড়াও হয়েছেন। ইউপিডিএফ -এর বিরুদ্ধে অস্ত্রবাজি করতে ও নিজের জাত ভাইকে খুন করতে অপারগ হওয়ায় সন্তু লারমা তাদের রেশন বন্ধ করে দিয়েছেন। কত নীচু ও জঘন্য মানসিকতার অধিকারী হলে এটা করা সম্ভব তা দেখালেন সন্তু লারমা। মোট কথা, সন্তু লারমা ও তার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের জন্য কেউ এখন এতটুকু শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না।

শেষে সন্তু লারমার উদ্দেশ্যে আবারও আহ্বান, হয় আসুন জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলি, নয়ত নিজেরা আন্দোলনের কর্মসূচী দিন। ইউপিডিএফ আপনাদের এই আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতো করবেই না, যেমনটা কোন সময় করেনি, বরং এই আন্দোলন জনগণের পক্ষে হলে ইউপিডিএফ আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে।

আর যদি এ দু'টোর কোনটি করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইউপিডিএফ -এর আন্দোলনে সরকারের পক্ষ হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। নিজেরাও আন্দোলন করবেন না, আবার ইউপিডিএফ ও জনগণ দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে চাইলে তাতে বাধা দেবেন জনগণ তা কোন মতেই সহ্য করবে না।

অতীতে জনগণের বিপক্ষে গিয়ে যারা সরকারের দালালি করেছে তাদের কারোর পরিণাম ভালো হয়নি। জনগণ ভালোভাবেই জানেন, চুক্তির ফলে সন্তু লারমা ও তার দোসররা সরকারী মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য সুবিধা পেলেও তারা কিছুই পাননি। ফলে না পাওয়ার বঞ্চনা আন্দোলনকে আরো বেশী তীব্রতর করতে ও জঙ্গী রূপ দিতে বাধ্য।

যে কোন দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে জনগণের এ আন্দোলন রোধ করা কখনো সম্ভব নয়। জনগণ ও ইউপিডিএফ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের এই সংকট মোকাবিলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ❑

১২ সেপ্টেম্বর, ২০০০

পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজ

ধ্রুবজ্যোতি চাকমা

নারী সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তথা নারী অধিকার সম্পর্কে দেশে কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়। কিন্তু অতীব পরিহাসের বিষয়, নারীদের ভাগ্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। পত্রিকার পাতা খুললেই নারীদের ওপর বিশেষত দরিদ্র মেহনতি নারীদের ওপর বিভিন্ন নির্যাতনের খবর পড়লে আতংকিত না হয়ে পারা যায় না। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সমাজের অবস্থা আরো বেশী করুণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা একদিকে যেমন পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত, অপর দিকে তারা সরকারের লেলিয়ে দেয়া রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। সেনাশাসন কবলিত পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি বা বিদ্রোহ দমন নীতির আঘাত তাদের উপরই পড়ে সবচাইতে বেশী। সেনাবাহিনী কর্তৃক যে নারী ধর্ষণ হয় এই কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির একটি কৌশল। ফলে সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নারী নির্যাতেনের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে।

তথাকথিত শান্তিচুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সমাজের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেনাবাহিনী ও বসতিস্থাপনকারী কর্তৃক নারী নির্যাতন এখনো নিত্যনৈতিত্তিক ঘটনা। ১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৯ দিঘীনালার বাবুছড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে হাট বাজারে সেনা সদস্য কর্তৃক একজন জুম্ম নারী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ও তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সেনা আক্রমণ এই সত্যকেই নির্দেশ করে। শুধু বাবুছড়ার ঘটনা নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকায়ও এ ধরণের ঘটনা অহরহ ঘটছে। এ সকল ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া এ লেখার উদ্দেশ্য নয় এবং তা এখানে সম্ভবও নয়।

সেনাবাহিনীর নির্যাতন ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীরা পুরুষতন্ত্রের তথা সমাজের চাপিয়ে দেয়া নানা ধরণের বিধি নিষেধ ও নিয়ম কানুনের শিকার। তাদের ওপর উদ্যত অসংখ্য রক্তচক্ষু। জুম্ম নারীদের উপর পুরুষদের অত্যাচার কেবল গ্রামে কিংবা পাহাড়ে সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি যারা শহরে যারা বসবাস করেন তাদের অনেক পরিবারের অভ্যন্তরেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে দু' দণ্ড শান্তি পাবে সে আশা করা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের যেন কল্পনা বিলাস মাত্র। বাইরে কাজের শেষে ক্লান্ত শরীরে বাড়িতে এসেও রীতিমত পুরুষদের সেবা, ছেলে মেয়েদের দেখাশোনাসহ যাবতীয় সাংসারিক কাজ করতে হয় তাদের। মনে করা হয় এসব কাজ যেন শুধু নারীদের জন্য, পুরুষদের নয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কি পরিবারের মধ্যে কি সমাজে কি রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীদের কোন মর্যদা নেই।

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম সমাজে নারীদের মনে করা হোত অলক্ষুণে ও সকল দুর্ঘটনার কারণ। এই দোষ নব বধূদের উপরই বেশী চাপানো হোত। হঠাৎ পরিবারে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বলা হোত, বধূটি অলুক্ষণে, যার কারণে পরিবারে এই দুর্ঘটনা। যেন যা কিছু খারাপ তা নারীদের করণেই ঘটে, পুরুষদের দ্বারা কিছুই ঘটেনা, পুরুষরা যেন পুত-পবিত্র। নারীদের লক্ষীটি সেজে ঘরের কোণে বসে থাকতে হয় অথচ পুরুষদের ব্যাপারে লক্ষী-অলক্ষীর প্রশ্নই উঠেনা। সংস্কারের ভয়ে নারীদের তা মেনে নিতে হত।

নারী সমাজকে কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে বেরিয়ে আসতে উৎসাহ দেবার দায়িত্ব শুধু নারী নেত্রীদের নয়, এই প্রজন্মের পুরুষদেরও। নতুন শতাব্দীতে এসেও সমাজের কুসংস্কারের বেড়াজাল দিয়ে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলে নারী সমাজের এগিয়ে আসা মোটেই সম্ভব নয়। সব ধরনের কুসংস্কার ও গোড়ামীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে আসা পুরুষদেরই কর্তব্য। কাজেই নারীদের দক্ষতাকে শ্রদ্ধা করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

নারীরা জাতির অর্ধেক শক্তি। এই শক্তিকে অবহেলা করে বর্তমানে কোন সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। কোন শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করা যায় না। কোন সমাজে নারীরা কতটুকু অগ্রসর বা তারা কতটুকু অধিকার ভোগ করে তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় সে সমাজ কত অগ্রসর। উন্নত জাতির পূর্বশর্ত উন্নত ও অগ্রসর নারী সমাজ। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চলছে তাতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিগত দিনগুলোতে জুম্ম নারীদেরকে অনেক সময় মিছিলের পুরোভাগে দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। ভবিষ্যত আন্দোলনে তাদেরকে আরো বেশী সংগ্রামী সহযোদ্ধা হিসেবে পাওয়া যাবে এটাই আশা। তাছাড়া, তাদেরকে পুরো আন্দোলনেও নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে নিজেদের প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে হবে। ❑

'শান্তি চুক্তি' পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান নয়

বেনজিন চাকমা, খাগড়াছড়ি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ধারণ করে বসবাস করছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। আঠার শতকের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে চলে গেলে শুরু হয় তাদের উপর অবর্ণনীয় শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন। ব্রিটিশদের চলে যাবার পরও এই শোষণ ও নিপীড়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। পাকিস্তান সরকার এই পার্বত্য জনপদের সহজ সরল মানুষদের ভারতপন্থী আখ্যায়িত করে দমন পীড়ন চালায়। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের শত বছর ধরে নিপীড়িত সহজ সরল পাহাড়ীরাও মুক্তির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অচিরেই পাহাড়ীদের এই স্বপ্ন এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য, কন্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন নির্যাতন রয়ে গেছে আলবৎ। শাসকগোষ্ঠির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠি পাহাড়ীদেরকে তাদের জাতিগত পরিচয় লুপ্ত করে বাঙালী বানাতে সচেষ্ট থাকে। সংবিধানে তাদের কোন অধিকার দেয়া হয়নি। সেনা মোতায়েন করা হয় দ্রুত গতিতে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা। ফলে পাহাড়ী জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। অশান্ত হয়ে ওঠে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনপদ। শুরু হয় জাতিগত সংঘাত। সেনাশাসনের বুটের তলায় পিষ্ট হয় মানবতা।

প্রায় দু'যুগেরও বেশী সময় পর বিরাজিত রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধান করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য গত ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতি মতৈক্যের ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং ঐ চুক্তিকে উভয় পক্ষ "শান্তি চুক্তি" বলে আখ্যায়িত করে। এই শান্তি চুক্তি(?) সম্পাদনের আড়াই বছরের বেশী অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু বিগত দু'দশকের শ্বাসরুদ্ধকর অসহনীয় অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কি? আজ এই প্রশ্ন শুধু আমার নয়। এই প্রশ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নিপীড়িত পাহাড়ী জনগণের তথা সমগ্র বাংলাদেশের বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীরও।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা মূলত: রাজনৈতিক সমস্যা। সুতরাং একমাত্র যথার্থ রাজনৈতিক সমাধানই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। ক্ষতাসীন আওয়ামী লীগ ও জেএসএস সম্পাদিত শান্তি চুক্তি (?) পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। কারণ এই তথাকথিত শান্তি চুক্তিতে জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেনা প্রত্যাহার, প্রথাগত ভূমি অধিকার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের স্বসম্মানে প্রত্যাহারসহ ইত্যাদি মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান মেলেনি। তাই পার্বত্য জনপদে সরাসারি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সেনাবাহিনীর হাতে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা, পাহাড়ী জনগণের উপর নির্বিচারে গণহত্যা, গুম, নারী অধিকার হরণ ইত্যাদি ঘটনা আগের মতো ঘটে চলেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে গত ১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৯ দীঘিনালার বাবুছড়া বাজারে সেনাসদস্য কর্তৃক ১৬ বছরের কিশোরী লাঞ্ছিত হওয়া এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র দিপন জ্যোতি সহ চার জনকে নৃশংসভাবে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা, অসংখ্য খুন, ধর্ষণ, অপহরণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়াকেই প্রমাণ করে। সেনাবাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র যুদ্ধ নেই বটে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি সম্পাদনোত্তর কালেও জনগণের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। জনসংহতি সমিতি বলছে সরকার চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করছে না বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসছে না এবং চুক্তির ফলে পাহাড়ী মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিল তা পূরণ হচ্ছে না। তারা আরও বলে যে সরকারের একটি বিশেষ মহলের চক্রান্তের ফলেই নাকি চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, জনগণের কাছে জেএসএস-এর এই ধরণের বক্তব্য আসলে ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে সরকার দেশে বিদেশে এবং মিডিয়ায় খুব জোরালোভাবে প্রচার করছে যে চুক্তির প্রায় নব্বই ভাগ বাস্তবায়ন (?) করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন শান্তি এসেছে। এসব ভাওতাবাজি ও অপপ্রচারণা সত্ত্বেও পাহাড়ীরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষের মনে নতুন করে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হতে পারে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করছেন।

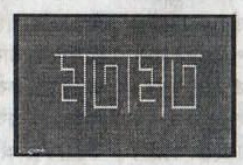

সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতি যদিও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য জনগণের কাছে উপস্থাপন করছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সেটা ঢাকা স্টেডিয়ামের পাতানো ফুটবল খেলার মতোই বলা যায়। কতগুলো মৌলিক বিষয়ে তাদের চরিত্র এক এবং অভিন্ন। তারা এখন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। গত ২৩ সেপ্টেম্বরে শেখ হাসিনার ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণের সময় জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা স্বয়ং প্যারিসে উপস্থিত থেকে আন্তর্জাতিকভাবে শেখ হাসিনার বক্তব্যগুলো সমর্থন দিয়ে এসেছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন শান্তি এসেছে। শান্তির হাওয়া বইছে। আবার সন্তু লারমা ফিরে এসে জনগণের কাছে বলছে সরকার চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করছে না। সরকার যখন চুক্তির বাস্তবায়ন করছেই না তাহলে কোন যুক্তিতে সন্তু লারমা হাসিনার সাথে প্যারিস গমন করলেন? আসলে বর্তমান ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিশেষ সুবিধাবাদী নব্য দালাল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি সৃষ্টি করেছে মাত্র। যার মাধ্যমে সরকার তার রাষ্ট্রীয় শোষণ নির্যাতন প্রক্রিয়ার ভিত্তিটাই শক্ত করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা পাহাড়ী জনগণকে নিয়ে যে চক্রান্ত সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে চুক্তি সম্পাদান করা হয়েছে। গণতন্ত্রের মুখোশধারী এই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার এখন জনসংহতি সমিতির প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদি গোষ্ঠির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণের উপর শোষণ নিপীড়ন আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য খুবই সূক্ষ্মভাবে জনসংহতি সমিতির প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিকে দিয়েই রাজনৈতিক কর্মসূচীগুলো সম্পাদন করছে।

জনসংহতি সমিতির তথাকথিত শান্তিচুক্তি সাথে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের চাপিয়ে দেয়া গণবিরোধী জেলা পরিষদের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। যা নতুন বোতলে পুরানো মদের মতোই। '৮৯ এ এরশাদের জেলা পরিষদ যেমন সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, তেমনি বর্তমান চুক্তির মধ্য দিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হয়নি।

অন্যদিকে পাহাড়ী জনগণের বিরাট একটা শিক্ষিত রাজনৈতিক সচেতন অংশ পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন প্রথম থেকেই চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সম্পাদিত চুক্তিকে তারা জনসংহতি সমিতির একটি 'আপোষ চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলছেন এই 'আপোষ চুক্তির' মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত পাহাড়ী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি। তারা মনে করেন পূর্ণস্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান এবং পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাই তারা নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদনের পরপরই মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তিন সংগঠন যৌথভাবে ঢাকায় পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনের মধ্যদিয়ে 'ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' বা ইউপিডিএফ নামে একটি রাজনৈতিক পার্টির জন্ম দেয়। এই ইউপিডিএফ সহ তিন সহযোগী সংগঠন পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে উপেক্ষা করে চুক্তি অনুয়ায়ী বাংলাদেশের ভূমি আইনের প্রচলিত নিয়মে ভূমি সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় এবং এই সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়মে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জনগণ তাদের হারানো ভূমি ফিরে পাবে না। তাদের মতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মোতায়েনকৃত সেনা সদস্যকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা সহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশকৃত বাঙ্গালীদের স্ব সম্মানে ফিরিয়ে আনা এবং জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হলেই কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী সমাধান সম্ভব। জনসংহতি সমিতির তথাকথিত শান্তিচুক্তির সাথে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের চাপিয়ে দেয়া গণবিরোধী জেলা পরিষদের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। যা নতুন বোতলে পুরানো মদের মতোই। '৮৯ এ এরশাদের জেলা পরিষদ যেমন সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, তেমনি বর্তমান চুক্তির মধ্য দিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হয়নি। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য লেখক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মি সহ সকলকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ❑

পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসক শ্রেণীর খেলা

বদরুদ্দীন উমর

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ও পুলিশের সাথে চক্রান্তমূলক যোগসাজশের মাধ্যমে সন্তু বাবুর দল এখন ইউনাইটেড পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সাথে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন এটাই আজকের পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙলাদেশের সমগ্র শাসক শ্রেণী ও বর্তমানে তাদের ক্ষমতাশীল দল আওয়ামী লীগের সব থেকে কুৎসিত এবং অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক খেলা। এই খেলার মাধ্যমে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বিভক্ত করে, তাদের মধ্যে সরকারের ও শাসক শ্রেণীর সহযোগী একটি অংশকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, সেখানকার জনগণের ওপর নিজেদের শোষণ শাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী নির্যাতন কায়েম রাখার ব্যবস্থা করেছে। এবং এত কালের সংগ্রামী পুরুষ সন্তু লারমা এখন এই খেলায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন সরকার ও সমগ্র শাসক শ্রেণীর এক ক্রীড়নক মাত্র।

বাঙলাদেশ বহু জাতির দেশ হলেও বাঙলাদেশ রাষ্ট্র কোন বহুজাতিক রাষ্ট্র নয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো সে রাষ্ট্র বাঙালী উগ্র জাতীয়তাবাদীদের রাষ্ট্র হিসেবেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত নিজের চরিত্র অটুট রেখেছে। বাঙলাদেশ শুধু বহু জাতির দেশই নয়, এদেশ বহু ভাষাভাষির দেশও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষার স্থান নেই। বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের "মহানায়ক" ও "প্রতিষ্ঠাতা" হিসেবে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর দ্বারা প্রচারিত ও সেই হিসেবে অন্যান্য অনেক দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর কাছে পরিচিত শেখ মুজিবর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩টি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তা এবং উর্দু, চাকমা, সাঁওতাল ইত্যাদি ভাষাভাষিদেরকে বাঙালী হওয়ার এবং নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় সব কিছু করার নির্দেশ দিয়ে এক ধরনের ফ্যাসিস্ট ও নিপীড়ক রাষ্ট্র হিসেবে বাঙলাদেশের যে চরিত্র ও ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন তার মধ্যেই আদর্শগতভাবে বাঙালী উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটেছিলো। সেই হিসেবে বাঙলাদেশ রাষ্ট্র দল নির্বিশেষে শাসক শ্রেণীর সমগ্র অংশের দ্বারাই একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে এসেছে। এদিক দিয়ে দলীয় স্বার্থ নিয়ে পরস্পরের সাথে নানা প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত দলগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত ও বাস্তবতঃ কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তারা সকলেই একই গর্তের শেয়াল।

বহু জাতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও একজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে বাঙলাদেশে জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন হচ্ছে তার সব থেকে উচ্চারিত রূপ এখন দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের ক্ষেত্রে। আমাদের বর্তমান আলোচনা এই বিশেষ নিপীড়ন ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এ বিষয়ে আমরা আগেও লিখেছি। কিন্তু ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে (১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি হয় -সম্পাদক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে বাঙলাদেশ সরকারের একটি তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে ঐ সমগ্র অঞ্চলে পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং পাহাড়ী জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও যে বিভক্তি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাই ১৯৯৮ পরবর্তী অবস্থার সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির যে চুক্তি ১৯৯৮ সালে হয়েছে তার মূল হোতা এই চুক্তির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কেউ নয়। এর প্রকৃত হোতা হলো ভারত। অবশ্য এখানেই বলে রাখা দরকার যে, ভারত শান্তি চুক্তির হোতা একথা বিএনপি অথবা ঐ ধরনের দলগুলি যে ভাবে বলছে তার সাথে চুক্তির আসল কারণের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই এজন্য যে, ভারত চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করতে চায় বিএনপি এই প্রচারের মধ্যে দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নেই। আসলে এ ধরনের দখল বর্তমান দুনিয়ায় আর সম্ভব নয়, এর কোন প্রয়োজনও ভারতের নেই। রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের অত্যাধুনিক কলাকৌশল অনুয়ায়ী কোন দেশের ওপর হুকুমদারী করা ও সে দেশের জনগণের ঘাড় ভেঙে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে শারীরিক দখলের কোন প্রয়োজন হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ইত্যাদি রাষ্ট্র আমাদের দেশে যা করছে তার থেকে এর বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে?

ভারত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মূল হোতা এ কারণে যে, তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী জাতিগুলির সশস্ত্র সংগ্রামের মোকাবেলা করার জন্যে তাদের দরকার ভারত-বাঙলাদেশ সীমান্ত বন্ধ করা। কারণ এ সীমান্ত যদি পারাপারের জন্য খোলা থাকে তাহলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের উলফা, বোড়ো, নাগা, মিজো ইত্যাদি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বাঙলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে আসা, আশ্রয় লাভ, এমনকি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা বন্ধ রাখার উপায় নেই। বাঙলাদেশ সরকার সেটা না চাইলেও সে রকম তৎপরতা তারা গোপনে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে। কাজেই এক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য দরকার ভারত-বাঙলাদেশ সীমান্ত বন্ধ করা। কিন্তু যতদিন ত্রিপুরায় জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অংশ শান্তিবাহিনী ভারতের আশ্রয়ে থেকে সে দেশকে তাদের সংগ্রামের পশ্চাৎভূমি হিসেবে ব্যবহার করবে ততদিন ভারত ও বাঙলাদেশের মধ্যে তাদের যাতায়াত ও পারাপার থাকবে। এবং সেটা থাকলে অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকার কারণে, ভারতের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষতঃ ত্রিপুরায়, জনসংহতি সমিতির শান্তিবাহিনীর শিবির ও ঘাঁটি বন্ধ করে দিয়ে তাঁদেরকে বাঙলাদেশে ফেরৎ পাঠানো ভারতের জন্যে হয়ে দাঁড়ায় এক জরুরী রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ভারত একদিকে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীকে ভারত ছাড়ার নোটিশ প্রদান করে তাঁদেরকে বাঙলাদেশের সাথে শান্তি চুক্তির জন্য নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে বাঙলাদেশ সরকারকেও তারা তাগিদ দেয় জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তি চুক্তির জন্য।

এই পরিস্থিতিতে জনসংহতি সমিতি ও তার নেতা সন্তু লারমার অবস্থা দাঁড়ায় রীতিমত সংকটজনক। তাঁদের নিজেদের শক্তির মধ্যেও একটা ভাঙনের প্রক্রিয়া জারী থাকলেও এবং সেটাও তাঁদের ক্রমশঃ দুর্বল করতে থাকা সত্ত্বেও ভারতের চাপ তাঁদের জন্য শান্তি চুক্তির পক্ষে এক বাধ্যতার শর্ত সৃষ্টি করে। এই বাধ্যতার বিষয়ে বাঙলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলো এবং সে কারণে চুক্তির ব্যাপারে তারা শক্ত হাতেই হাল ধরেছিলো। এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বাহিনীকে বাঙলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলো এবং বাঙলাদেশ সরকার অসম শর্তে জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিরোধবিহীন অবস্থায় পাহাড়ী জনগণের ওপর নিজেদের শোষণ নিপীড়ন আগের থেকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করার সম্ভাবনা দেখেছিলো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, এক প্রকার অসহায় অবস্থায় জনসংহতি ও শান্তিবাহিনী এবং তার নেতা সন্তু লারমা বাঙলাদেশ সরকারের সাথে "শান্তি চুক্তি" নামে এক অসম ও পদানত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই চুক্তির মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিলো যে, ভারত ও বাঙলাদেশ সরকার এবং সমগ্রিকভাবে এই দুই দেশের শাসক শ্রেণীর কেউই পাহাড়ী জনগণের বন্ধু নয়। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থে পাহাড়ীদেরকে ব্যবহার করতে পারে, চুক্তি করে অথবা চুক্তি না করেও, কিন্তু তাদের থেকে পাহাড়ী জনগণের কোন অংশের পাওয়ার কিছু নেই। শোষক ও নির্যাতকদের কাছে শোষিত ও নিপীড়িতদের যা প্রাপ্য আছে শুধু সেটাই তারা পেয়ে থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমেও তারা এর থেকে বেশী আর কিছুই পায় নি।

চুক্তির মধ্যে যেটুকু ছিলো তারও বিশেষ কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি একথা বলে সন্তু লারমা বেশ কিছুদিন থেকেই অনেক কান্নাকাটি করছেন, বাঙলাদেশ সরকারের কাছে অদ্ভুত ভাষায় দাবী জানানোর মধ্যে দিয়ে নিজের অভিমান ব্যক্ত করছেন। চুক্তির পরিণতি যে এটাই হবে এবং সন্তু লারমা ও তাঁর দল যে চুক্তির দুই পক্ষের মধ্যে নতজানু পক্ষ সেটা খাগড়াছড়িতে চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই সেখানকার জৌলুসপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেখা গিয়েছিলো। সন্তু লারমা তাঁর লোকজন নিয়ে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু যে বিস্ময়ের ব্যাপার, এবং জনসংহতি সমিতি ও সন্তু লারমার জন্য যে অপমানজনক ব্যাপার সেখানে ঘটেছিল সেটা হলো এই যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বিজয়িনীর মূর্তি ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদ বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা সেখানে করলেও চুক্তির অপর পক্ষ জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমাকে সেখানে কোন বক্তৃতা করতে দেওয়া হয় নি। দুই পক্ষের এ ধরণের চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্য কোথাও এ রকম কোন ন্যক্কারজনক ব্যাপার ঘটেছে বলে জানা নেই। কিন্তু এ নিয়ে সন্তু লারমা অথবা জনসংহতি সমিতির অন্য কোন নেতাকে প্রতিবাদ করতে দেখা তো দূরের কথা, কিছু বলতেও কেউ শোনে নি! হতে পারে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের এই "কর্মসূচী" সন্তুবাবুদের সাথে আলোচনা করেই ঠিক হয়েছিলো। হতে পারে, এ নিয়ে কোন আলোচনারও তোয়াক্কা সরকার পক্ষ করেনি। কিন্তু এই "সামান্য" ঘটনার মধ্যেই চুক্তির পরিপূর্ণ অগণতান্ত্রিক চরিত্র এবং সন্তুবাবুদের নতজানু অবস্থান বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছিলো।

এরপর আরও আছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর "শান্তি" এমনকি "বিশ্ব শান্তির" অগ্রদূত হিসেবে নিজেকে প্রচার করার চেষ্টায় ঢাকায় হাসিনার উদ্যোগে তাঁর নিজেরই এক আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। পুরো ব্যাপারটি অতি নিম্ন রুচির পরিচায়ক এবং শান্তি চুক্তি সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করার এক অপচেষ্টা হলেও তার অপর দিকটি ছিলো, সেই অনুষ্ঠানে চুক্তির অপর পক্ষ সন্তু লারমা ও তাঁর দলের অনুপস্থিতি!

এখানেই শেষ নয়, এই শান্তি চুক্তির দোহাই দিয়ে ভারত তো বটেই, সাম্রাজ্যবাদীদের একাধিক কেন্দ্রে হাসিনাকে শান্তির অগ্রদূত হিসেবে নানা ধরনের পুরস্কারে ও সম্মানে ভূষিত করার জন্য অনেক তদবীরও সর্বত্র করা হয়েছে এবং ইউনেস্কো থেকে নিয়ে ইউরোপ আমেরিকা কয়েকটি কলেজ ও তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে পুরষ্কৃত করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বন্ধের বড়ো রকম চেষ্টা হিসেবে পুরষ্কার স্বরূপ বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসিনার মতো এক মহা মূর্খকে দেশিকোত্তম ডিগ্রী পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে! এই ডিগ্রী হাসিনাকে দেওয়া হয়েছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ভারতের স্বার্থ উদ্ধার ও খেদমতের জন্য পাহাড়ী জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার জন্য। এই একই কারণে কলকাতায় ১৯৯৯ এর ফেব্রুয়ারিতে বইমেলার উদ্বোধনও করানো হয়েছিলো হাসিনাকে দিয়ে!!

এবার আসা যেতে পারে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি" র অন্য একটি দিকে। এই চুক্তির মাধ্যমে যেভাবে অস্ত্র সমর্পণ করা হয়েছে সেটা শুধু -অস্ত্র সমর্পণই নয়। আসলে তা হলো আত্মসমর্পণ, একথা আগেই বলা হয়েছে। অস্ত্র সমর্পণটা ছিলো আত্মসমর্পণের এক প্রতিকী রূপ।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে খাগড়াছড়ির অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করলেও সব অস্ত্র তাঁরা সমর্পণ করেন নি। তাঁদের হাতে এখনো অস্ত্র আছে। থাকতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ খাগড়াছড়িতে শুধু অস্ত্র সমর্পণ করা হয় নি, সমর্পণ করা হয়েছিলো সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ও লাইন। কাজেই কিছু অস্ত্র তখন বা এখনো তাঁদের হাতে থাকলেও সে অস্ত্র দিয়ে কোন রাজনৈতিক সুবিধে হবে না। তা ব্যবহার করার মতো শর্ত আর নেই। কাজেই অস্ত্র থাকলেও তাতে জঙ ধরে তা ইতিমধ্যেই অকেজো হয়েছে, অথবা তা না হলেও অদূর ভবিষ্যতেই অকেজো হবে। তবে সেগুলি দিয়ে যা করা সম্ভব সেটা আগের মতো সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাসের কাজই সেই অস্ত্র দিয়ে করা সম্ভব এবং সেই বাস্তবতাই এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে বাঙলাদেশ সরকার একদিকে সেখানে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে এখন আগের থেকে অনেক নিশ্চিন্তে পাহাড়ীদের ওপর তাদের শোষণ নির্যাতন চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। এটা তাদের এক মস্ত লাভ। কিন্তু এই চুক্তির মাধ্যমে তাদের আরও বড় লাভ হয়েছে এই যে, এর দ্বারা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করে সাধারণভাবে সেখানকার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে সাময়িকভাবে হলেও, ভালোভাবে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের একটি অংশকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিজেদের শাসন যন্ত্রের কলকাঠি হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারটি খুব ফলপ্রসু ও গুরুত্বপূর্ণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠা মানবেন্দ্র লারমা ও তাঁর সহযোগীরা করলেও তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের "মহানায়ক" শেখ মুজিবর রহমান ও ফ্যাসিস্ট চরিত্রসম্পন্ন তাঁর রাজনীতিক দল। তাঁরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণকে কোন অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁদেরকে বাঙালী হতে বলা এবং মানবেন্দ্র লারমাসহ অন্যদেরকে নানাভাবে অপমান করার ফলেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাহাড়ী জনগণের পক্ষে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি ও পরে শান্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিলো। কাজেই গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করতে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামই ছিলো প্রথম থেকেই জনসংহতি সমিতির পক্ষে এমন এক করণীয় কাজ যে করণীয় বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর নির্যাতন নীতির দ্বারাই তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিলো। পাহাড়ী জনগণ হঠাৎ করে সে লাইন নিজেদের জন্যে নির্ধারণ করেন নি।

সন্তু লারমা আজ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিজেকে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর পদানত করে তাদের শাসনযন্ত্রের নাটবল্টুতে পরিণত হলেও তিনি অতীতে মানবেন্দ্র লারমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাহাড়ী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের সে সংগ্রাম কোন অগৌরবের ব্যাপার ছিলো না। উপরন্তু তাঁরা ছিলেন ১৯৭৩ সালে শুরু হওয়া পাহাড়ী জনগণের গৌরবময় গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই ঐতিহ্যবাহী। সন্তু বাবুর আজকের অবস্থানের কারণে পাহাড়ী জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর এবং তাঁর অনেক সহযোগীর সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা অথবা ছোট করার অর্থ ইতিহাসকে বিকৃত করা, পাহাড়ী জনগণের সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে অস্বীকার করা।

একথাগুলি বলার প্রয়োজন হলো এ কারণে যে, সংগ্রামের এই ঐতিহ্যের কারণে জনসংহতি সমিতি এবং তার নেতা সন্তু লারমার এক ভাবমূর্তি এখনো পাহাড়ী জনগণের একটি বড়ো অংশের মধ্যে আছে। কিন্তু সে ভাবমূর্তির প্রকৃত অবস্থা হলো, সূর্যাস্তের পর আকাশের রঙের ঘনঘটার মতো। তার মধ্যে সূর্যের রেশ আছে, কিন্তু তেজ নেই, এবং সেটা অন্ধকারের আগু আবির্ভাবই ঘোষণা করে। সমস্ত পূর্ব ঐতিহ্য সত্ত্বেও সন্তু বাবুদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই রকম। যেভাবে বাঙলাদেশের ফ্যাসিস্ট শাসক শ্রেণীর কাঠামোর মধ্যে তাঁরা এখন প্রবেশ করেছেন সেটা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানকে অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করবে।

কিন্তু তার আগে অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণকে জমিজমাসহ নানা অধিকারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো সেটা কার্যকর হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা না থাকায় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও বিক্ষোভ আবার নোতুন করে দানা বাঁধছে এবং তাঁদের সেই প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে সাংগঠনিক রূপও লাভ করতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া যে পাহাড়ীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সাথে তাঁদের আত্মসমর্পণকারী অংশের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক, বিশেষ করে সরকারী পক্ষ যদি নোতুন গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সাধারণ গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হতে না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাস শুরু করে এবং সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও সমগ্র প্রশাসনকে সে কাজে নিযুক্ত

৭ম পাতায় দেখুন

৬ষ্ঠ পাতার পর

রাখে এবং আত্মসমর্পণকারী অংশ এ ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগী ও কলকাঠি হিসেবে কাজ করে।

ঠিক এই পরিস্থিতিই এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে। জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা এখন নিয়মিত ও বিরামহীনভাবে সর্বত্র বলছেন যে, ১৯৯৮ সালের ২ ডিসেম্বর (এটা ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর হবে -সম্পাদক) সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হয় নি এবং সেটা না হওয়ার কারণ সরকারের একটি "বিশেষ মহল" এই চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধী।

রাজনীতিতে হেঁয়ালীর কোন স্থান নেই। কিন্তু সন্তু লারমার এই বক্তব্যে, যা তিনি বারবার, অসংখ্যবার বলে যাচ্ছেন, হেঁয়ালী ছাড়া আর কিছুই নেই। কোন "বিশেষ মহল" শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধিতা করছে যারা এমন শক্তিশালী যে তাদের বিরোধিতার কারণেই এই বহুল প্রচারিত শান্তি চুক্তি ও শান্তির সম্ভাবনা বানচাল হচ্ছে? এই "বিশেষ মহল" কি প্রধানমন্ত্রীর থেকেও শক্তিশালী? এর অর্থ কি এই যে, প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদের শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ষোল আনা সদিচ্ছা সত্ত্বেও "বিশেষ মহল" এর বিরোধিতার কারণে এই চুক্তি এতদিন পরও বাস্তবায়িত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না? আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী এরকম কোন "বিশেষ মহল" আছে বলে আমাদের জানা নেই। তাহলে এই "বিশেষ মহল" কি প্রধানমন্ত্রী নিজেই, যিনি শান্তি চুক্তি ভাঙ্গিয়ে শান্তির অগ্রদূত হিসেবে নিজের ঢেঁড়ি নিজেই পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং নানা রকম পুরস্কার নিজের ঝুড়িতে তুলে আত্মগৌরব প্রচার করছেন?

এই সম্ভাবনাই বেশি এবং আসলে "শান্তির অগ্রদূত" প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদই এই "বিশেষ মহল" হওয়ার কারণে সন্তু বাবু একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও "বিশেষ মহলের" বিষয়ে বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট কিছু না বলে অরাজনৈতিক হেঁয়ালী সৃষ্টি করছেন।

সন্তু লারমার নিজের মতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামই নয়, সারা বাঙলাদেশই উপকৃত হবে। তাই যদি হয়, তাহলে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং শান্তি চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসেবে তাঁর আশু ও জরুরী কর্তব্য হলো, এই "বিশেষ মহলের" মুখোশ উন্মোচন করা। এটা না করে শুধু "বিশেষ মহল" এর কারণে চুক্তি কার্যকর হচ্ছে না, একথা বলে বেড়িয়ে নিজেকে দায়মুক্ত রাখার চেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক সততা অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের গরিব ও শোষিত নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁর কোন দায়িত্ববোধ আছে এটা বলা যাবে না। কাজেই তাঁকে এখন স্পষ্টভাবে বলতে হবে, এই "বিশেষ মহল" এর পরিচয় কি? তারা কারা?

এসব না করে সন্তু লারমা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির প্রধান কাজ এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাঁরা শান্তি চুক্তিকে একটি ভুয়া এবং প্রতারণামূলক চুক্তি হিসেবে সঠিকভাবে আখ্যায়িত করে তার বিরোধিতা প্রথম থেকেই করেছেন তাঁদেরই বিরোধিতা করা। শুধু বিরোধিতা করা নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসিত, বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা প্রচার চালিয়ে এবং সরকারী প্রশাসন ও পুলিশের সাথে চক্রান্তমূলক যোগসাজশের মাধ্যমে তাঁদেরকে নানাভাবে হয়রানী করা, এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপও পরিচালনা করা। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি রিপোর্ট কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছি ('খাগড়াছড়িতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সম্মেলনে প্রশাসন ও পুলিশের নির্যাতকের ভূমিকা'। দৈনিক যুগান্তর, ২৪.৫. ২০০০)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ও পুলিশের সাথে চক্রান্তমূলক যোগসাজশের মাধ্যমে সন্তু বাবুর দল এখন ইউনাইটেড পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সাথে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন এটাই আজকের পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙলাদেশের সমগ্র শাসক শ্রেণী ও বর্তমানে তাদের ক্ষমতাশীল দল আওয়ামী লীগের সব থেকে কুৎসিত এবং অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক খেলা। এই খেলার মাধ্যমে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বিভক্ত করে, তাদের মধ্যে সরকারের ও শাসক শ্রেণীর সহযোগী একটি অংশকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, সেখানকার জনগণের ওপর নিজেদের শোষণ শাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী নির্যাতন কায়েম রাখার ব্যবস্থা করেছে। এবং এত কালের সংগ্রামী পুরুষ সন্তু লারমা এখন এই খেলায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন সরকার ও সমগ্র শাসক শ্রেণীর এক ক্রীড়নক মাত্র। এটা শুধু তাঁর জন্যই এক মর্মান্তিক ও শোচনীয় ব্যাপার নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও তাঁদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এক অতিশয় ক্ষতিকারক পরিস্থিতি।

জনসংহতি সমিতি এবং সন্তু লারমা কর্তৃক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে ভারতের চাপ এবং বাধ্যতার একটা ভুমিকা যে ছিলো, এটা আগেই বলা হয়েছে। চুক্তি করার পর তিনি চুক্তির বাস্তবায়নের কথা বলছেন এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদের একথা বোঝা দরকার যে, চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যের পাশাপাশি তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যাঁরা গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নিযুক্ত আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে বৈরী অবস্থান গ্রহণ করে, ঐ ব্যাপারে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁরা নিজেদের অবস্থানকেই দূর্বল করছেন। এ উপলব্দি তাঁদের মধ্যে এখনো না আসা তাঁদের জন্য এক অতি বড়ো রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কি?

জনসংহতি সমিতিকে একথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সরকারের একটি "বিশেষ মহল" তাঁদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি কার্যকর করতে দিচ্ছে না একথা বারবার বলে যাওয়ার ফলে শীঘ্রই এটা এক একঘেয়ে এবং অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার হিসেবে পাহাড়ী জনগণের কাছে স্পষ্ট হবে। তাঁরা এই অবাস্তবায়নযোগ্য চুক্তির জন্যে সন্তু লারমা ও তাঁর দলকেই পুরোপুরি দায়ী করে যাঁরা এ চুক্তির বিরোধিতা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছেন তাঁদের পক্ষেই বিপুল সংখ্যায় ও ব্যাপকভাবে সমর্থন প্রদান করবেন। অর্থাৎ পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যাতে সন্তু বাবুরা যদি এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত চিন্তা না করেন এবং বাঙলাদেশ সরকার ও বাঙলাদেশের উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে তাদের সাথেই সহযোগিতার সম্পর্ক রাখেন, অথবা রাখতে বাধ্য হন, তাহলে তাঁরা পাহাড়ী জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে অন্তগামী শক্তিতেই পরিণতি হবেন এবং তাঁদের বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিই হয়ে দাঁড়াবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তি। আসলে এটাই ঘটছে এবং ঠিক এ কারণেই বর্তমান বাঙলাদেশ সরকার এই উদীয়মান শক্তিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই সন্তু লারমা ও জনসংহতি সমিতির সাথে আঁতাতবদ্ধ হয়ে পাহাড়ী জনগণকে বিভক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণী পাহাড়ী জনগণকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করার যে খেলা চক্রান্তমূলকভাবে শুরু করেছে সেই চক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে কে কতখানি ও কত শক্তিশালীভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে তার ওপরই নির্ভর করবে তাদের ভবিষ্যৎ। কারণ বাঙলাদেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট শাসক শ্রেণী জনগণকে বিভক্ত করার জন্য সেখানে নিজেদের অনুগত একটি শ্রেণী সৃষ্টি করলেও সেখানকার জনগণের মধ্যে ঐক্যের সূত্রটি হলো তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বাস্তব শর্তাবলীই চুক্তি পরবর্তী পর্যায়ে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে এবং বিকশিত হচ্ছে। ২৭.৫.২০০০

(সৌজন্যে: সংস্কৃতি, জুন, ২০০০)

দুই নাম্বারী কর্তৃক ধনরতন অপহৃত

জুরাছড়ি-সুবলং প্রতিনিধি ॥ গত ২ জুলাই দুই নাম্বারী বলে পরিচিত সন্ত্রাসীরা ধনরতন চাকমাকে অপহরণ করে। সন্ত্রাসীরা তাকে বনযোগী ছড়া বাজারে লঞ্চ থেকে নামিয়ে রাখে। এরপর তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানা যায়নি। ধনরতন চাকমা পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক।

এ অপহরণ ঘটনার পর এলাকার লোকজনের প্রশ্ন, আসলে জুরাছড়িতে সরকারের প্রশাসন বলতে কোনকিছু আছে কি?

পুলিশের নাকে ডগায় খোদ বাজারে জলজ্যান্ত একটি লোককে অপহরণ করা হচ্ছে, অথচ পুলিশ ও প্রশাসন নীরব।

দুই নাম্বারীদের অত্যাচারে নানাক্রুম গ্রামের জনগণ অতিষ্ঠ ॥ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ॥ জেলার নান্যাচর থানার নানাক্রুম গ্রামে কুখ্যাত সন্ত্রাসী রাজমুণি চাকমা ও ব্রজ গোপাল চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর অত্যাচারে এলাকার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এ সশস্ত্র দলটি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে লোকজনকে নানাভাবে অত্যাচার হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে। তাছাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই নাম্বারী হিসেবে পরিচিত এ সন্ত্রাসীরা জেএসএস-এর আত্মসমর্পনের পর থেকেই প্রকাশ্যে এই অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে। প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে এরা এলাকায় নির্বিঘ্নে অরাজকতার রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে।

জানা গেছে, এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে থানায় একের অধিক বিভিন্ন মামলা ঝুলে আছে। বর্তমানে এই সন্ত্রাসী গ্রুপটি নানাক্রুম গ্রামে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। মদ, গাঁজা, হিরোইন ফেনসিডিল সেবন ও জুয়ার আসর চলে নিয়মিত। প্রশাসন ও সেনাকর্তারা দেখেও না দেখার ভাণ করে। দু'নাম্বারীদের এ কার্যকলাপে বাধা দিতে গিয়ে ঐ গ্রামের প্রধান নীলকান্ত কার্বারীকে গত বছর প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত খুনীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা প্রশাসন নেয়নি। সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইউপিডিএফ কর্মি নিহত

॥ স্বাধিকার রিপোর্ট ॥

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার হারুবিল গ্রামে জেএসএস-এর সন্ত্রাসীদের গুলিতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের আরো এক কর্মি গত ২৩ জুন খুন হয়েছেন।

ইউপিডিএফ -এর সদস্য লক্ষীরাম চাকমা (৩০) পিতা- নীল মনি চাকমা হারুবিল গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কিছু দুরে জেএসএস সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হয়েছেন। সে দিন রাত্রে সন্ত্রাসীরা লক্ষীরামদের বাড়ি ঘিরে রাখে। এবং ভোর সাড়ে ছয়টার দিকে তাকে বেঁধে ফেলে। সন্ত্রাসীরা তার ভাইকে ধরার চেষ্টা করলে তিনি পালিয়ে যান। পালানোর সময় সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি সামান্য আহত হন। পরে লক্ষীরামকে সন্ত্রাসীরা বাড়ি থেকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে গুলি করে। তিনি সাথে সাথে প্রাণ হারান। সন্ত্রাসীদের খবর পার্শ্ববর্তী বিডিআর ক্যাম্পে জানানো হলেও বিডিআর কোন কর্ণপাত করেনি। বরং ক্যাম্প থেকে মন্তব্য করা হয় তাদের বাইরে যাওয়ার অর্ডার নেই। বিডিআর এর নিষ্ক্রিয়তায় সন্ত্রাসীরা তাদের অপকর্ম ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। লক্ষীরামের হত্যার ঘটনায় এলাকায় জনগণ তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

এ হত্যার ঘটনায় নেতৃত্ব দেয় জেএসএস-এর সন্ত্রাসী ইন্দু বাবু (বিজিমু-অ)। দলে প্রায় ১০/১২ জন সন্ত্রাসী ছিল।

ইউপিডিএফ-এর আহ্বায়ক প্রসিত বি. খীসা এক বিবৃতিতে জেএসএস সন্ত্রাসীদের দ্বারা লক্ষীরাম চাকমা খুন হওয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি সন্তু চক্রকে জাতীয় বেঈমান আখ্যায়িত করে বলেন, সরকারের নীল নক্সা অনুসারেই জেএসএস এ হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে বাধা দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের এ ষড়যন্ত্র কখনোই সফল হবে না। জুম্ম জনগণ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সকল ষড়যন্ত্র বাঁধা অতিক্রম করেই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, ইউপিডিএফ-এর নেতৃবৃন্দ জনগণকে সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীর লেলিয়ে দেয়া মুখোশদের নির্মূল করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নব্য দালাল সন্তু চক্রকেও জনগণ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। এটা আজ কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আরো দু'জন ইউপিডিএফ কর্মি খুন

পানছড়ি প্রতিনিধি ॥ জাতীয় বেঈমান বিশ্বাসঘাতক সন্তু চক্রের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা সরকারের জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের নীল নক্সা বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইউপিডিএফ-এর বারংবার আলোচনার প্রস্তাব সত্ত্বেও সন্তু চক্র পার্টি ও জনগণের ওপর তার বর্বর হামলা অব্যাহত রেখেছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারা আরো দু'জন ইউপিডিএফ কর্মিকে গুলি করে হত্যা করেছে। এ নিয়ে জেএসএস সন্ত্রাসীদের হাতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩০ জনে। ঐদিন সকাল ৭টার দিকে সন্ত্রাসীরা পানছড়ি থানার তারাবন মুখ গ্রামে হামলা চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ কর্মিরা একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সন্ত্রাসীদের এ হামলায় কুন্তিমাছড়া গ্রামের অরুণ কান্তি চাকমা পিতা সহশিং চাকমা ও গোলক পুদিমাছড়ার সুমেন্ত চাকমা ঘটনাস্থলেই মারা যান। এছাড়া গুরুতর আহত হন উদয়ন চাকমা, বাধী চাকমা, সুবোধ চাকমা, জুলু চাকমা, অসীম চাকমা, শামা চাকমা ও মোতাই ত্রিপুরা। প্রথমোক্ত দু'জনকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়াতো দূরের কথা, বরং উল্টো এ দু'জনের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা ঝুলে দেয়ার পাঁয়তারা করছে বলে জানা গেছে।

রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপর ৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন। এরা হলেন সোহাগ, শোভন ও রেমিন।

সন্ত্রাসীদের এই সশস্ত্র হামলার পর এলাকায় সাধারণ জনগণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের অভিমত, সন্তু লারমা ইউপিডিএফ-এর সাথে আলোচনায় না বসে উল্টো তাদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে জাতির জন্য চরম ক্ষতি করছেন। এটা কখনো ক্ষমা করা যায় না। সরকার ও সেনাবাহিনীর নির্দেশেই সন্তু চক্র এ ধরণের জঘন্য অপরাধ করছেন বলে তারা মন্তব্য করেন। তারা মনে করেন, জেএসএস-এর সন্তু চক্রকে পোষ মানানোর পর যাতে পরবর্তীতে আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য সরকার ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করতে চাইছে। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে সন্তু চক্রকে "শিকারী মোরগের" মতো ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।

সাধারণ জনগণের বিশ্বাস, সরকারের সহায়তায় সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফ-এর আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। কারণ ইউপিডিএফ ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক লাইন অত্যন্ত পরিস্কার ও বাস্তব সম্মত।

সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল- জাপান -এর বার্ষিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

জাপান প্রতিনিধি ॥ গত ২৪ ও ২৫শে জুন, ২০০০ টোকিওর কেন্দ্রস্থলে সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল-জাপান -এর দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে আগত সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল এর কর্মিরা হলেন এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি, যারা নিজ নিজ অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের জীবন যাত্রা ও বর্তমান সময়ে তাদের জীবন সংগ্রাম ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চলগুলো হচ্ছে রাশিয়ার দূরপ্রাচ্য, ফিলিপাইনের মিন্দানাও, ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়া, বার্মার কারেন্নি (Karenni) সম্প্রদায় ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্বের আলোচনায় সাম্প্রতিক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি, তথাকথিত শান্তিচুক্তির অসারতা, সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দুর্বার গণআন্দোলন সৃষ্টি ও দমন পীড়নের কথা স্থান পায়। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন চিচিক্কো চাকমা, সোনারাম চাকমা ও শেখা চাকমা। এরা সবাই জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান এর যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

আলোচনার এক পর্যায়ে বার্মার প্রতিনিধি চুক্তিউত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলে, তাকে পিজিপি-পিসিপি-এইচডব্লিউএফ কর্তৃক ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত Why We Oppose Government-PCJSS Agreement নামক বিবৃতিটি দেয়া হয় এবং তিনি তা পড়ে মন্তব্য করে বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখনো "গুরুতর"। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে যথাসাধ্য কাজ করে যাবেন বলেও আশ্বাস প্রদান করেন। উল্লেখ্য, তিনি মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রচার সংগঠন হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং চুক্তির পর শান্তি ফিরে এসেছে মনে করে তিনি তার কাজে বার্মার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সবশেষে তথাকথিত চুক্তি বর্জন করে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জাপান সহ সমগ্র বিশ্বে সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের জন্য একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়। ❑

কাউখালিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

কাউখালি প্রতিনিধি॥ প্রশাসনের উদাসীনতা, অবহেলায় রাঙামাটি জেলার কাউখালি থানার দুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘ তিন বছর ধরে শিক্ষা কার্যক্রম অচল হয়ে আছে। এলাকার শত শত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অভিভাবকরা পড়েছে দুশ্চিন্তায়।

কাউখালি থানার নভাঙা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রাঙ্গীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'টিতে দীর্ঘ তিন বছর ধরে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। কর্তৃপক্ষের কাছে আরো শিক্ষক নিয়োগের আবেদন জানালেও কোন কাজ হয়নি। বিদ্যালয় দু'টিতে নিয়োজিত শিক্ষকদ্বয় অভিযোগ করে বলেন, একার পক্ষে একটি স্কুল চালানো অসম্ভব। তাছাড়া শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন কাজ যেমন- ভোটার লিস্ট করা, শিক্ষা জরিপ সহ নানান অফিসিয়াল কাজ করতে হয়। সে সময়ে স্কুল বন্ধ দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। এর সাথে আরো সমস্যা যোগ হয়েছে স্কুল গুলোর জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। কোন সংস্কারের উদ্যোগ নেই, আসবাবপত্রও নেই। এলাকার অভিভাবক, জনপ্রতিনিধিরা সমস্যা সমাধানের জন্য বার বার প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেও কোন ফল পায়নি। তাই এলাকার জনগণের দাবি কোমলমতি শিশুদেরকে শিক্ষার আলো দেয়ার জন্য বিদ্যালয় দু'টিকে বাঁচানো জরুরী। এলাকার জনগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষার দুরাবস্থা নিয়ে স্বাধিকারে একাধিক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এসব প্রতিবেদন গুলোতে শিক্ষকের স্বল্পতা, স্কুল গুলোর জীর্ণশীর্ণ অবস্থা, শিক্ষক নিয়োগ থাকলেও স্কুলে অনুপস্থিত থাকা, এসব অনিয়মের সাথে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজস থাকা বিষয় গুলি বেরিয়ে আসছে। পার্বত্য এলাকায় শিক্ষার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ও সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ জনপ্রতিনিধিদের সজাগ দৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত জরুরী।

সাঁওতাল গ্রামে হত্যা ও হামলার প্রতিবাদে পিসিপি'র বিক্ষোভ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নওগাঁ জেলায় সাঁওতাল পল্লীতে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও আলফ্রেড সরেন হত্যার প্রতিবাদে ২০ আগস্ট বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্তরে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন চম্পানন চাকমা, সমারী চাকমা, বেনজিন চাকমা, মিঠুন চাকমা, বিন্দু রঞ্জন চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা সাঁওতাল জাতিসত্তার নেতা আলফ্রেড সরেন হত্যার নিন্দা জানিয়ে বলেন, উত্তর বঙ্গে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের উপর হামলা নতুন কিছু নয়। এ ধরনে অসংখ্য ঘটনা অনেক বার ঘটেছে যা প্রকাশিত হয়নি। সেখানে এবং অন্যান্য আরো অনেক অঞ্চলে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে তাদের নিজ জায়গা জমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও নানাভাবে হয়রানি করা হয়। তারা চরম নির্যাতনের শিকার। কোন সরকার আজ পর্যন্ত তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি। সরকার ও শাসকশ্রেণী বরাবরই জোতদারদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ফলে তারা সংখ্যালঘুদের ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আলফ্রেড সরেনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

বক্তারা আরো বলেন, যতদিন পর্যন্ত এ দেশের সকল জাতিসত্তাদের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে না ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকবে। তাই সময় এসেছে দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। বক্তারা সাঁওতাল জাতিসত্তার নেতাকে হত্যা, অনেককে আহত ও পল্লীতে অগ্নি সংযোকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্থদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপুরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৮ আগষ্ট সকাল ১১টায় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ভীমপুর গ্রামে স্থানীয় জোতদার গদাই লস্কর ও সাবেক চেয়ারম্যান হাতেম আলীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা সাঁওতালদের উপর হামলা চালায়। এতে স্থানীয় সাঁওতাল নেতা আলফ্রেড সরেনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা অনেককে আহত করে এবং পল্লীর ১৫ টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ❑

শহীদ ভূবন জয় চাকমা ও শহীদ জগদীশ চাকমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ৫ জুলাই পিসিপি ভাইবোনছড়া শাখার উদ্যোগে শিব মন্দির এলাকায় শহীদ ভূবনজয় চাকমা ও শহীদ জগদীশ চাকমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

সকালে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শহীদ পরিবারের সদস্যবর্গ, ইউপিডিএফ -এর পক্ষে দীপায়ন চাকমা ও অরুণ বিকাশ চাকমা, পিসিপি জেলা শাখার সহসভাপতি স্বপন চাকমা, ভাইবোন ছড়া শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ঝন্টু চাকমা ও সুদীপ্ত চাকমা শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন। এছাড়া মুনিগ্রাম, রবিজয় পাড়া ও শিবমন্দির এলাকাবাসীর পক্ষ থেকেও পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

বিকেলের পর্বে ৩টায় এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঝন্টু চাকমা। শুরুতে শহীদদের স্মরণে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন অরুণ বিকাশ চাকমা, স্বপন চাকমা ও সুদীপ্ত চাকমা। সভা পরিচালনা করেন মতি বিকাশ চাকমা।

বক্তারা বলেন, আর্মি ক্যাম্প ও পুলিশ ক্যাম্পের পাশে দেওয়ান পাড়ায় অবস্থান নিয়ে উমাকান্ত ও সিন্ধু কুমার চাকমার নেতৃত্বে সন্তু লারমার বাহিনী নানা ধরণের অসামাজিক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে গ্রেফতার না করে পুলিশ শিবমন্দির এলাকায় প্রহরা দেয়ার নামে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি করে। বক্তারা বলেন, শহীদ ভূবনজয় চাকমা ও জগদীশ চাকমার খুনীদেরকে পুলিশ আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে যাতে জুম্ম জনগণের আন্দোলনে তারা ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

সভাপতি তার ভাষণে বলেন, খুন অপহরণ হুমকি গ্রেফতার ও ভয়ভীতি দেখিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যাবে না। অতীতে সেনাবাহিনী মুখোশ বাহিনী দিয়ে আন্দোলন সংগ্রামকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু লড়াকু জনগণের প্রবল প্রতিরোধের ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সরকার বর্তমানে বেপরোয়া হয়ে সন্তু লারমা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে দিয়ে জনগণের ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। সন্তু লারমা চক্রকে জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর জনগণ সরকারের এই নীল নক্সা নস্যাৎ করে দেবে এবং জাতীয় বেঈমান সন্তু চক্রকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। শহীদ ভূবন ও শহীদ জগদীশ সহ সকল শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না। আলোচনা শেষে সন্ধ্যে ৬টায় শহীদদের স্মরণে হাজার বাতি প্রজ্বলন করা হয়।

দুই নাম্বারীরা অনিবালার টাকা কেড়ে নিয়েছে

সুবলং প্রতিনিধি॥ এক মহিলার বহু কষ্টে অর্জিত টাকা জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে গেছে জেএসএস মদদপুষ্ঠ সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীরা। ঘটনাটি ঘটে গত ১২ আগষ্ট সুবলং বাজারে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মিসেস অনিবালা চাকমা (৩২) স্বামী- প্রভাত চাকমা রাঙামাটি জেলাধীন বরকল থানার অন্তর্গত দৌজরী পাড়ার বাসিন্দা। তিনি ঐদিন সুবলং বাজারে বিক্রির জন্য ২৬ কাঁদি কলা নিয়ে আসেন। সব কলা বিক্রি করে পান ১,৬০০ টাকা। কিন্তু হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নিজের ক্ষেতে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে পাওয়া এই টাকা ভোগ করার ভাগ্য তার কপালে জুটলো না। সব টাকা জোড় করে ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীরা। টাকা ছিনিয়ে নেয়ার সময় অনিবালা গ্রামের কয়েকজন তা প্রত্যক্ষ করেন। তারা দুই নাম্বারীদের এই জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং অন্তত কিছু টাকা ফেরত দিতে অনুরোধ করেন। দুই নাম্বারীরা গ্রামের মুরুব্বীদের এই অনুরোধ রক্ষা করাতো দূরের কথা, বরং তারা তাদেরকে নানান হুমকি দেয়। এমনকি মেরে ফেলার হুমকিও দেয়।

স্বামী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে অনিবালার পরিবার। তাদের সামান্য বাগিচা থেকে ফলমূল বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। অনিবালাদের অপরাধ তারা জেএসএস ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে সমর্থন করে না। তাই তারা দুই নাম্বারীদের দ্বারা হামলার শিকার হন। দুই নাম্বারীরা তাদের বাড়ির সব জিনিস পত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তাদেরকে গত ১৫ জুন তারিখে হামলা চালিয়ে ঘর ছাড়া করে। এতো সব করেও ক্ষান্ত হয়নি দুই নাম্বারীরা। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে অর্জিত টাকাও ছিনিয়ে নিলো সন্ত্রাসীরা।

সুবলং বাজার ঘাটে প্রশাসনের নাকের ডগায় এই দুই নাম্বারীরা নিয়মিত চাঁদাবাজি করে থাকে। অথচ প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। বরং এসব কাজে প্রশাসন মৌন সম্মতি দিয়ে থাকে। এসব সন্ত্রাসীরা আসলে সরকারেরই অংশ। এরা সরকারের পক্ষ হয়ে 'শান্তি' 'শান্তি' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বেড়ায়। আর সাধারণ খেতে খাওয়া লোকজনের ওপর হামলা ও উৎপীড়ন চালায়।

এই হচ্ছে সন্তু লারমার "শান্তিচুক্তির" ফল! কিন্তু সাধারণ লোকজন সন্তু লারমা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর অন্যায় অবিচার আর মুখ বুজে সহ্য করতে রাজী নয়। সন্ত্রাসীরা জনগণের সরলতা ও উদারতাকে দেখেছে, কিন্তু তারা তাদের আরেক রূপকে এখনো দেখেনি। সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের মনে রাখা উচিত এই সরলপ্রাণ মানুষ প্রয়োজনে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করতে পারে। তখন কোন শক্তি তাদের রক্ষা করতে পারবে না। সরকার কিংবা সন্তু চক্র তো নয়ই। কাজেই সময় থাকতে সাবধান! জনগণের সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। ❑

বাঘাইহাটে দুই নাম্বারীদের হাতে এক ব্যক্তি প্রহৃত

বাঘাইহাট প্রতিনিধি॥ শুধুমাত্র পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থী বা সমর্থক সন্দেহে বাঘাইহাট বাজারে গত ২৩ জুলাই রাজু চাকমা ওরফে কালাবো-অ (২৫) নামে এক ব্যক্তিকে জেএসএস-এর সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীরা বেদম মারধর করে।

সেদিন ছিল বাঘাইহাট বাজারের সাপ্তাহিক হাটের দিন। তিনি প্রয়োজনীয় বাজারের কাজে বাঘাইহাট বাজারে গিয়েছিলেন। বাজারে ঘুরার সময় সন্ত্রাসী দুই নাম্বারীরা তাকে চিনতে না পেরে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনপন্থী ভেবে তাকে পার্শ্ববর্তী খালি ফরেস্ট অফিসে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে সন্ত্রাসীরা ৭/৮ জন মিলে পিটিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত করে। মারপিটের সময় ফরেস্ট অফিসের পাশে আর্মি ও আনসারের একটি দল টহল দিচ্ছিল। সেনা-আনসারের ঐ দলটি সন্ত্রাসীদের কোন ধরনের বাধা দেয়ারও চেষ্টা করেনি।

বাঘাইহাট বাজারে প্রশাসনিক কোন অফিস নেই। আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করে বাঘাইহাট সেনা জোন। সন্ত্রাসীদের সাথে সেনাদের গোপন আঁতাত ও জেএসএস-এর আর্শিবাদ পেয়ে সন্ত্রাসীরা নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত রাজুর মত অনেক নিরীহ ব্যক্তি সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। এ ছাড়াও সন্ত্রাসীরা বাজারে আসা জুম্মদের থেকে নিয়মিত জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করছে। সন্ত্রাসীদের উৎপাতে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। বখাটে ছেলে সন্ত্রাসীদের উৎখাতের জন্য জনতা ঐকবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

কাট্টলী এলাকায় দুই নাম্বারীদের তান্ডব, জনগণ অতিষ্ঠ

কাট্টলী প্রতিনিধি॥ জেএসএস-এর প্রত্যক্ষ মদদে ও সহযোগিতায় দুই নাম্বারীরা কাট্টলী এলাকায় তান্ডবলীলা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা নির্বিচারে সাধারণ জনগণের উপর নির্যাতন হামলা হয়রানি জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছে। দুই নাম্বারীদের ভয়ে কেউ মুখ খুলে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। আর যারা প্রতিবাদ করতে চেয়েছে তাদেরকে নির্দয়ভাবে, প্রকাশ্যে মারধর করছে। এ ভাবে তারা এলাকার জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। রাঙামাটি থেকে দুই নাম্বারীদের একটি গ্রুপ গত ৪মে কাট্টলী এলাকায় এসে অবস্থান নেয়। এ গ্রুপটিই মূলত: এধরনের তান্ডবলীলা চালাচ্ছে। দুই নাম্বারীদের বিভিন্ন হামলার বর্ননা তুলে ধরা হলো-

১. ৪ মে, ২০০০ বড় হাড়িকাবা গ্রামের অন্নপূর্ণ চাকমা (৪৫) পিতা মৃত জ্বলন্ত চাকমা কে মারধর করে মারাত্মকভারে জখম করে। তার অপরাধ সে চুক্তিকে সমর্থন করতে পারে না এবং সন্তু লারমাকে এরজন্য সমালোচনা করেছিলো তাদের সামনে।

২. ৫ মে, ২০০০ ইউপিডিএফ -এর কর্মি রবীন্দ্র চাকমা (৪৪)কে ধুধুকছড়া থেকে দুই নাম্বারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে আর পাওয়া যায়নি। শোনা গেছে অপহরণের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে। সে ইউপিডিএফ -এর সাংগঠনিক কাজে রনছড়া এলাকায় গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি অপহৃত হন।

৩. ৬ মে, ২০০০ 'শান্তি চুক্তি'কে সমর্থন না করার কারণে গোলাছড়ি গ্রামের শ্যামল কান্তি চাকমা (২৫) ও অনিময় চাকমা (২৫)কে পিটিয়ে, শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে মারাত্মক ভাবে আহত করে।

৪. ১৭ মে, ২০০০ ইউপিডিএফ এর কর্মি জ্ঞান রঞ্জন চাকমা (২৫) সাংগঠনিক কাজে বেঙ্গীছড়া গ্রামে যাওয়ার পথে দুই নাম্বারীরা তার উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। দুই নাম্বারীরা সেখানে ওঁৎ পেতে ছিল। জ্ঞান রঞ্জন পায়ে গুলিবিদ্ধ হলেও কোন রকমে পালিয়ে রক্ষা পান। একই দিন জ্ঞান রঞ্জনের উপর হামলা শেষে ফেরার পথে বেঙ্গীছড়া গ্রামের দুই কিশোর ধুঙ্যে চাকমা (১২) ও অমিয় চাকমা (১৩)কে দুই নাম্বারীরা মারধর করে চলে যায়।

একের পর এক ঘটনা এলাকায় জনগণ আতংকিত হয়ে পড়েছে, তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

পিসিপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ১২ আগস্ট সকাল সাড়ে এগারটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চম্পানন চাকমা ও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মিঠুন চাকমার উপর হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। মিছিলটি কলাভবন ঘরে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশের রূপ নেয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মিঠুন চাকমা, ঢাকা শাখার রুইসা অং মারমা ও হিল উইমেন্স ফেড়ারেশনের মেকী খীসা প্রমুখ।

বক্তারা পিসিপি নেতৃবৃন্দের উপর হামলাকে জাতীয় বেঈমান সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের ন্যাক্কারজনক কাজ বলে উল্লেখ করেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আদিবাসী বর্ষ উৎযাপনের উছিলায় ঢাকায় এসে জাতীয় বেঈমান গণদুশমন সন্তু লারমা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে সন্তু লারমার মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পিসিপি নেতৃবৃন্দের উপর বিনা উষ্কানীতে নগ্ন হামলা চালানোর সাহস পাচ্ছে। বক্তারা অভিযোগ করে আরো বলেন, জনবিচ্ছিন্ন সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন-সন্ত্রাস চালিয়ে ক্ষান্ত নন। ঢাকায়ও তিনি ছাত্রদের মধ্যে হাতাহাতি লাগিয়ে দিতে চান। যার ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত হচ্ছে গতকাল শুক্রবার টিএসসিতে সংঘটিত ঘটনা।

টিএসসি'তে গতকাল ১১ আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় পিসিপি'র কয়েকজন কর্মির সাথে আড্ডা দেবার সময় সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা মদ্যপ অবস্থায় বিনা উষ্কানীতে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চম্পানন ও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মিঠুন চাকমার উপর শারীরিক ভাবে হামলা চালায়। চম্পানন চাকমাকে তারা পুলিশের নিকটও সোপর্দ করে। পরে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, ১২ আগষ্ট সকালে ডাকসু ভবনের সামনে পিসিপি'র সমাবেশ চলাকালেও সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে হামলা করতে উদ্যত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০০ পিসিপি ঢাকা শাখার উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। স্থান: টি.এস.সি অডিটোরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সময় বিকেল ৪টা। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবীন ছাত্রছাত্রীদেরকে এবং সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

-পিসিপি, ঢাকা শাখা

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা